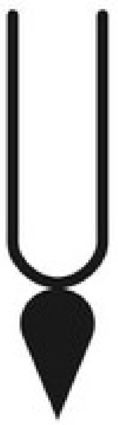


# একাদশী ও তুলসী তত্ত্ব

*বৌষ্ণব ভক্ত - দীনহীন অনুচর অজয় কুমার দে সংগ্রহিত ও লিখিত*

“হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপথে।
গোপেশ গোপীকা কান্ত রাধা কান্ত নমহস্তুতে ।।”

““বাঞ্ছাকল্প তরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যা বৈষ্ণবেভ্যে নমো নমঃ ।।””



সাটুই, মুর্শিদাবাদ

**আষাঢ় মাস, ১৪২৮**

# *উপক্রমণিকা:*

" ঈশ্বর সকলের প্রভু , সর্বজ্ঞ , নিয়ন্ত্রক , বিশ্বের কারণ , স্রষ্টা এবং ধ্বংসকারী " -উপনিষদ

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়,তিনি সম্পূর্ণ , যা হতে সকল কিছুর সৃষ্টি এবং যাতে সকলের প্রত্যাবর্তন , তিনিই ঈশ্বর।এই সম্পূর্ণ একককে বহুনামে ভূষিত করা হয়েছে বিভিন্নভাবে ।সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ একে বলেন ব্রহ্ম । এই ব্রহ্মই হচ্ছে সকল কিছুর মূল এবং কারণ । তিনিই পুরুষোত্তম , অবিনশ্বর ও অনন্ত । সকল বস্তুতে তিনি বিরাজমান , সকল কিছুই তাকে ছাড়া অস্তিত্বহীন । তিনি বিশ্বনিয়ন্ত্র , সর্বব্যাপী , সর্বশক্তিমান ও মহিমাময় ।

পরম কারণবাদের যৌক্তিকতা থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে পরমেশ্বর এক মহাকৌশলী । তিনি যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন তারও কারণ আছে । এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত । লক্ষ কোটি গ্রহ উপগ্রহ মহাকাশে নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হচ্ছে , জীবন্ত প্রাণীর বৈচিত্র্যের মাঝে শৃখলা আছে । এই কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রক একজন অপরিসীম ক্ষমতাবান পরমপুরুষ , অসংখ্য মস্তক , অনন্ত চক্ষু , অগণিত চরণ , তিনি সমগ্র বিশ্বে - সর্ব জীবে পরিব্যাপ্ত ।

এ বিশ্বে যা কিছু ঘটে তার একটি কারণ আছে । এই কারণেরও কারণ আছে এবং এইভাবে অফুরন্ত কারণ লক্ষ্য করা যায় । সৃষ্টির প্রথম কারণকে যদি প্রধান সূচনাকারী হিসেবে আখ্যা দেয়া যায় তবে দেখা যাবে তিনিই ঈশ্বর , তিনিই সৃষ্টির প্রথম কারণ ।

ধ্যানসাধনা ও মানুষের অভিজ্ঞতা হতে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায় । পূর্ণতা লাভের অর্থই জ্ঞানার্জন , শক্তিসঞ্চয় । ধার্মিকতা ও সততা জন্মলাভ করে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হতে । ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হতে নৈতিক চিন্তা বিকশিত হয় । অলৌকিক ঘটনা প্রবাহের প্রতি বিশ্বাস প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি আস্থারই নামান্তর মাত্র । যজুর্বেদে উল্লেখ আছে যে , " সুর্য তাকে প্রকাশ করতে পারে না , চন্দ্র তারকা এবং বিদ্যুও পারে না , অগ্নি কোন ছার । সর্বত্র তিনিই প্রকাশিত আছেন এবং সকল কিছু তিনিই প্রকাশ করেন । প্রাচীনকালেও প্রশ্ন উঠেছিল যে ঈশ্বর কি ? বেদান্ত তার উত্তর দিয়েছে যে , প্রাণী বা অপ্রাণী যেকোন বিষয় বা পদার্থ যে স্থান হতে জন্মলাভ করে অবশেষে বিলুপ্তির সময়ে যেখানে ফিরে যায় , তাই ব্রহ্ম অথবা অক্ষয় শক্তি বা ঈশ্বর । উদ্দয়নের মতে , বিশ্ব কোন কারণের ফলাফল । পৃথিবী , মাটি , জল , আলো, বাতাস দ্বারা গঠিত । এসব উপাদান সৃষ্টিতে প্রয়োজন কোন পরমশক্তিধর নিমিত্তের । ঈশ্বর ব্যতিত অনা কারো পক্ষে তা অসম্ভব । তাই বিশ্বসৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব ।

ন্যায় শাস্ত্র অনুসারে ভাল কাজের ফলাফল শুভ এবং মন্দ কাজের ফল অশুভ । ভাল ও খারাপ হৃদয়ে বিরাজ করে অবচেতনভাবে । এই চেতনার পরিচালনার জন্য

প্রয়োজন একজন শাসক । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ , তিনিই পুণ্যবানকে সুখী করেন , অপরাধীকে শাস্তি দেন , অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন । অন্তরকে পরিচালিত করা , ন্যায় ও অন্যায়কে নির্দিষ্ট করা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব নয় । বেদ হতে আমরা অভিজ্ঞতা এবং অলৌকিক জ্ঞান দুই - ই পাই । অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় সমূহকে পরীক্ষা করা যায় এবং অতিপ্রাকৃত বিষয় সম্পর্কেও ধারণা করা যায় । শ্রুতিশাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং ঋষিদের অভিজ্ঞতা অতিপ্রাকৃতকেও বাস্তবতার নিরিখে প্রমাণ করে যাতে প্রতীয়মান হয় , " ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন , সকলকে পরিচালনা করেন ।

তৃমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ

স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম

তুয়াততং বিশ্বমনন্তরূপ ।

[শ্রীমদ্ভগদ্ গীতা-১১/৩৮]

[তুমি অনাদিদেব , তুমি পুরাণ পুরুষ , তুমিই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ , একমাত্র প্রভু। তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞাতা । তুমিই একমাত্র পরমস্থান । হে অনন্তরূপ , তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত । ]

প্রতিটি ধর্মই তার অনুসারীদের জন্যে কিছু রীতি - নীতি , আচার - অনুষ্ঠান । প্রতিপালনের উপদেশ বা নির্দেশ দিয়ে থাকে । এ সকল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ;

( ১ ) কোন জীবকে জয়লাভে সাহায্য করা । ( ২ ) জীবের সাহায্যে উচ্চ প্রজ্ঞাকে আমন্ত্রণ করা যেমন , মুনি ঋষিদের সাহায্য কামনা করা । ( ৩ ) পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা ।

এই লক্ষ্য অর্জনে নানা প্রকার বস্তু , ক্রিয়াকলাপ , চালচলন ও শব্দকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যেন ফল লাভ সহজ ও দ্রুত হয় । সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতে গর্ভ অবস্থা থেকে বিবাহ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দশটি সংস্কার কর্ম করার নিয়ম প্রচলিত আছে । শাস্ত্রীয় মতে একে দশবিধ সংস্কার বলা হয় । হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে , দেহে ব্রহ্ম প্রাপ্তির অনুকূল গুণের উন্মেষ করতে হলে দশবিধ সংস্কার বিধি অবশ্যই পালন করতে হবে । সংস্কার কার্য সম্পাদিত হলে জনক - জননীর দোষ থাকলেও গর্ভাবস্থা থেকেই তা প্রশমিত হয়ে মানুষের দেহে ব্রহ্ম প্রাপ্তির অনুকূল গুণের উন্মেষ ঘটে ।

দশবিধ সংস্কার সমূহকে ৪টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

গর্ভ সংস্কার : গর্ভাধান , পুংসবন , সীমান্তোন্নয়ন ।

শৈশব সংস্কার : জাতকর্ম , নামকরণ , অন্নপ্রাশন ।

কৈশোর  সংস্কার : চূড়াকরণ , উপনয়ন , সমাবর্তন ।

যৌবন সংস্কার : বিবাহ ।

জীবনের প্রতিটি স্তরে সদগুণাবলিসমূহ সন্নিবেশিত করাই এই সংস্কার সমূহের মূল লক্ষ্য । সংস্কার সমূহের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বৈদিক ঋষিদের চিন্তাধারার সাথে সমন্বয় হয়েছে । ঋষিগণ জানতেন যে , অস্থি , স্নায় , মজ্জা , তুক , মাংস ও রক্ত - এই ষড়বিধ কোষের সম্মিলনে মানবদেহ সমুৎপন্ন । তন্মধ্যে প্রথমাক্ত তিনটি পিতৃ শরীর হতে এবং শেষাক্ত তিনটি মাতৃদেহ হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে ।

নামকরণ , অন্নপ্রাশন , চূড়াকরণ , উপনয়ন , সমাবর্তন সংস্কারের সময়ও বিধান উল্লেখ আছে । প্রতিটি অনুষ্ঠানে একটি জীবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির যে কামনা করা হয় তা পৃথিবীর যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট শ্রদ্ধার পাত্র । সনাতনীদের জীবন বেদে উল্লেখিত ১৬টি সনাতন ধর্মীয় সংস্কার বা রীতি বা প্রথা বা কৃষ্টিকালচার ও আচারের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। মানবের জীবন জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু অর্থাৎ আত্মা দেহ ধারণ বা ভ্রণ সৃষ্টি থেকে শুরু করে আত্মার দেহ ত্যাগ বা মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত এই ধর্মীয় রীতি বা প্রথা বা আচার বা সংস্কার চক্রটি যেভাবে মানব জীবনের উপর আবর্তিত হয় তাহাই হলো ষোড়শ সংস্কার।এই আচার বিধি ছাড়াও বিধি ভক্তির কথাও উল্লেখ আছে হিন্দু শাস্ত্রে যার সর্বোত্তম হল একাদশী।আর একাদশী পালন করার পূর্বে তুলসী তত্ব না জানলে একাদশী সম্পূর্ণ হতেই পারে না।

তাই তুলূসী তত্ত্ব ও একাদশী নিয়ে জানাও খুব প্রয়োজন , বিশদে জানার ইচ্ছে অনেক ভক্তের থাকলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে না ।এই পুস্তকে একাদশী ও তুলসী তত্ব সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুস্তকের পাঠে পাঠকের  কৃষ্ণভক্তি লাভ হলেই আমার এই পুস্তক রঞ্জনের সার্থকর্তা।

**উৎসর্গ:  পোড়াডাঙ্গা , তিলিপাড়া গ্রামবাসী ও সকল বৌষ্ণব ভক্তবৃন্দ**

# একাদশী ব্রত পালনের নিয়ম ও একাদশী মাহত্ম্য

## একাদশী কী?

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ।।

একাদশী একটি চান্দ্র তিথি। চাঁদের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথি, হিন্দু ধর্মমতানুসারে পুণ্যতিথি হিসেবে বিবেচিত। হিন্দুধর্মমতে নিরম্বু উপবাস বিহিত। একাদশী ব্রত অবশ্য পালনীয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার লীলাবিলাসের প্রথম থেকেই "একাদশী উপবাসের" প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীল জীব-গোস্বামী তার ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে স্কন্ধ পুরাণের একটি উদ্‌ধৃ্তি দিয়ে বলেছেন, "যে মানুষ একাদশীর দিন শস্যদানা গ্রহণ করে সে তার পিতা, মাতা, ভাই এবং গুরু হত্যাকারী, সে যদি বৈকুণ্ঠ লোকেও উন্নীত হয়, তবুও তার অধঃপতন হয়।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা ১৫/৮-১০)

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট রয়েছে। তাই মায়া তাকে এ জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে। পরম করুণাময় ভগবান কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করতে মায়াগ্রস্ত জীবের কল্যাণে বেদপুরাণ আদি শাস্ত্রগ্রন্থাবলী দান করেছেন। ভক্তি হচ্ছে ভগবানকে জানার ও ভগবৎ প্রীতি সাধনের একমাত্র সহজ উপায়। শাস্ত্রে যে চৌষট্রি প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে একাদশী ব্রত সর্বোত্তম। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি নবধা ভক্তির পরই দশম ভক্ত্যাঙ্গরূপে একাদশীর স্থান। এই তিথিকে হরিবাসর বলা হয়। তাই ভক্তি লাভেচ্ছু সকলেই একাদশী ব্রত পালনের পরম উপযোগীতার কথা বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। একাদশী তিথি সকলের অভীষ্ট প্রদানকারী। এই ব্রত পালনে সমস্ত প্রকার পাপ বিনষ্ট, সর্বসৌভাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আট থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত যেকোন ব্যক্তিরই ভক্তিসহকারে পবিত্র একাদশী ব্রত পালন করা কর্তব্য। সঙ্কটজনক অবস্থা বা জন্মমৃত্যুর অশৌচে কখনও একাদশী পরিত্যাগ করতে নেই। একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হলে সেইদিন না করে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করা উচিত। শুধু বৈষ্ণবেরাই নয়, শিবের উপাসক, সূর্য-চন্দ্র-ইন্দ্রাদি যেকোন দেবোপাসক, সকলেরই কর্তব্য একাদশী ব্রত পালন করা। দুর্লভ মানবজীবন লাভ করেও এই ব্রত অনুষ্ঠান না করলে বহু দুঃখে-কষ্টে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে হয়

অহংকারবশত একাদশী ব্রত ত্যাগ করলে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যে ব্যাক্তি এই ব্রতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, জীবিত হয়েও সে মৃতের সমান। কেউ যদি বলে “একাদশী পালনের দরকারটা কি?” সে নিশ্চয় কুম্ভিপাক নরকের যাত্রী। যারা একাদশী পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে শনির কোপে তারা বিনষ্ট হয়। একাদশীকে উপেক্ষা করে তীর্থ

স্থান আদি অন্য ব্রত পালনকারীর অবস্থা গাছের গোড়া কেটে পাতায় জল দানের মতোই।
একাদশী বাদ দিয়ে যারা দেহধর্মে অধিক আগ্রহ দেখায়, ধর্মের নামে পাপরাশিতে তাদের উদর পূর্ণ হয়। কলহ-বিবাদের কারণেও একাদশী দিনে উপবাস করলে অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চিত হয়। পুণ্যপ্রদায়িনী সর্বশ্রেষ্ঠ এই ব্রত শ্রীহরির অতি প্রিয়। একাদশী ব্রত পালনে যে ফল লাভ হয়, অশ্বমেধ, রাজসূয় ও বাজপেয় যজ্ঞদ্বারাও তা হয় না। দেবরাজ ইন্দ্রও যথাবিধি একাদশী পালনকারীকে সম্মান করেন। একাদশী ব্রতে ভাগবত শ্রবণে পৃথিবী দানের ফল লাভ হয়। অনাহার থেকে হরিনাম, হরিকথা, রাত্রিজাগরণে একাদশী পালন করা কর্তব্য।
কেউ যদি একাদশী ব্রতে শুধু উপবাস করে তাতে বহু ফল পাওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তেরা এই দিনে একাদশ ইন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেন। একাদশীতে শস্যমধ্যে সমস্ত পাপ অবস্থান করে। তাই চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, সরিষা আদি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য একাদশী দিনে বর্জন করা উচিত। নির্জলা উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি জল, দুধ, ফল-মূল, এমনকি আলু, পেপে, কলা, ঘিয়ে বা বাদাম তেল অথবা সূর্যমুখী তেলে রান্না অনুকল্প প্রসাদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন। রবিশস্য (ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও সরিষা) ও সোয়াবিন তেল অবশ্যই বর্জনীয়। দশমী বিদ্ধা একাদশীর দিন বাদ দিয়ে দ্বাদশী বিদ্ধা একাদশী ব্রত পালন করতে হয়।

একাদশীতে সূর্যোদয়ের পূর্বে বা সুর্যোদয়কালে ( ১ঘন্টা ৩৬ মিনিটের মধ্যে) যদি দশমী স্পর্শ হয়, তাকে দশমী বিদ্ধা বলে জেনে পরদিন একাদশীব্রত পালন করতে হয়। মহাদ্বাদশীর আগমন হলে একাদশীর উপবাস ব্রতটি মহাদ্বাদশীতেই করতে হয়। একাদশী ব্রত করে পরের দিন উপযুক্ত সময়ে শস্যজাতীয় প্রসাদ গ্রহণ করে পারণ করতে হয়। শাস্ত্রবিধি না মেনে নিজের মনগড়া একাদশী ব্রত করলে কোন ফল লাভ হয় না। দৈববশত যদি কখনও একাদশী ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে ক্ষমা ভিক্ষা করে পুনরায় ব্রত পালন করতে হয়।

## একাদশী পালনের নিয়মাবলী

ভোরে শয্যা ত্যাগ করে শুচিশুদ্ধ হয়ে শ্রীহরির মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা করতে হয়, “হে শ্রীকৃষ্ণ, আজ যেন এই মঙ্গলময়ী পবিত্র একাদশী সুন্দরভাবে পালন করতে পারি, আপনি আমাকে কৃপা করুন।” একাদশীতে গায়ে তেল মাখা, সাবান মাখা, পরনিন্দা-পরচর্চা, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, দিবানিদ্রা, সাংসারিক আলাপাদি বর্জনীয়। এই দিন গঙ্গা আদি তীর্থে স্নান করতে হয়। মন্দির মার্জন, শ্রীহরির পূজার্চনা, স্তবস্তুতি, গীতা-ভাগবত পাঠ আলোচনায় বেশি করে সময় অতিবাহিত করতে হয়।

এই তিথিতে গোবিন্দের লীলা স্মরণ এবং তাঁর দিব্য নাম শ্রবণ করাই হচ্ছে সর্বোত্তম।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের একাদশীতে পঁশিচ মালা বা যথেষ্ট সময় পেলে আরো বেশি জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একাদশীর দিন ক্ষৌরকর্মাদি নিষিদ্ধ। একাদশী ব্রত পালনে ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ আদি বহু অনিত্য ফলের উল্লেখ শাস্ত্রে থাকলেও শ্রীহরিভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম লাভই এই ব্রত পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভক্তগণ শ্রীহরির সন্তোষ বিধানের জন্যই এই ব্রত পালন করেন। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস আদি গ্রন্থে এ সকল কথা বর্ণিত আছে।

বছরে ছাব্বিশটি একাদশী আসে। সাধারণত বার মাসে চব্বিশটি একাদশী। এইগুলি হচ্ছে-

১. উৎপন্না একাদশী - ২. মোক্ষদা একাদশী
৩. সফলা একাদশী , - ৪ . পুত্রদা একাদশী
৫. ষটতিলা একাদশী - ৬. জয় একাদশী
৭. বিজয়া একাদশী - ৮. মলকী একাদশী
৯. পাপমোচনী একাদশী - ১০. কামদা একাদশী
১১. বরুথিনী একাদশী - ১২. মোহিনী একাদশী
১৩. অপরা একাদশী - ১৪. নির্জলা একাদশী
১৫. যোগিনী একাদশী - ১৬. শয়ন একাদশী
১৭. কামিকা একাদশী - ১৮. পবিত্রা একাদশী
১৯. অন্নদা একাদশী - ২০. পরিবর্তিনী বা পার্শ্ব একাদশী
২১. ইন্দিরা একাদশী - ২২. পাশাঙ্কুশা একাদশী
২৩. রমা একাদশী - ২৪. উত্থান একাদশী

কিন্তু যে বৎসর পুরুষোত্তমাস, অধিমাস বা মলমাস থাকে, সেই বৎসর পদ্মিনী ও পরমা নামে আরও দুটি একাদশীর আবির্ভাব হয়। যারা যথাবিধি একাদশী উপবাসে অসমর্থ অথবা ব্রতদিনে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণে অসমর্থ, তারা এই একাদশী মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করলে অসীম সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন।

একাদশীর মূল কাজ হল– নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করা। তাই আপনারা যে নিয়মে, যে সময়ে পালন করুন না কেন, ভগবানকে ভক্তিভরে স্মরণ করাই যেন আপনারই মূল কাজ হয়। একাদশী পালনের সাত্বিক নিয়মগুলো হলো:

১। সমর্থ পক্ষে দশমীতে একাহার, একাদশীতে নিরাহার, ও দ্বাদশীতে একাহার করতে হবে ।

২। তা হতে অসমর্থ পক্ষে শুধুমাত্র একাদশীতে অনাহার।

৩। যদি উহাতেও অসমর্থ হন, একাদশীতে পঞ্চ রবিশস্য বর্জন করে ফলমূলাদি অনুকল্প গ্রহণের বিধান রয়েছে।

সমর্থ পক্ষে রাত জাগরণের বিধি আছে, গৌড়ীয় ধারায বা আচার্যবৃন্দের অনুমোদিত পঞ্জিকায় যে সমস্ত একাদশী নির্জলা (জল ব্যতীত) পালনের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সেগুলি সেমতে পালন করলে সর্বোত্তম হয়। নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় থেকে নিরাহার থাকতে অপারগ হলে নির্জলাসহ অন্যান্য একাদশীতে কিছু — সবজি, ফলমূলাদি গ্রহণ করা যেতে পারে । যেমন — গোল আলু, মিষ্টি আলু, চাল কুমড়ো, পেঁপে, টমেটো, ফুলকপি ইত্যাদি সবজি ঘি অথবা বাদাম তেল দিয়ে রান্না করে ভগবানকে উৎসর্গ করে আহার করতে পারেন। হলুদ, মরিচ, ও লবণ ব্যবহার্য। আবার অন্যান্য আহার্য, যেমন — দুধ, কলা, আপেল, আঙুর, আনারস, আখ, আমড়া শস্য, তরমুজ, বেল, নারিকেল, মিষ্টি আলু , বাদাম ও লেবুর শরবত ইত্যাদি ফলমূলাদিও খাওয়া যেতে পারে ।

একাদশীতে পাঁচ প্রকার রবিশস্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছেঃ—

১। ধানজাতীয় সকল প্রকার খাদ্য যেমন – চাউল, মুড়ি, চিড়া, সুজি, পায়েস, খিচুড়ি, চালের পিঠা, খৈ ইত্যাদি

২। গমজাতীয় সকল প্রকার খাদ্য যেমন – আটা, ময়দা, সুজি, বেকারির রুটি , বা সকল প্রকার বিস্কুট, হরলিকস ইত্যাদি ।

৩। যব বা ভুট্টাজাতীয় সকল প্রকার খাদ্য যেমন — ছাতু, খই, রুটি ইত্যাদি ।

৪। ডালজাতীয় সকল প্রকার খাদ্য যেমন — মুগ, মাসকলাই, খেসারি, মসুরি, ছোলা অড়হর, ফেলন, মটরশুঁটি, বরবটি ও সিম ইত্যাদি ।

৫। সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, তিলের তেল ইত্যাদি। উপর্যুক্ত পঞ্চ রবিশস্যের যেকোন একটি একাদশীতে গ্রহণ করলে ব্রত নষ্ট হয়।

উল্লেখ্য যারা সাত্ত্বিক আহারী নন এবং চা, বিড়ি/সিগারেট, পান, কফি ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন, একাদশী ব্রত পালনের সময়কাল পর্যন্ত এগুলি গ্রহণ না করাই ভালো।

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, একাদশী করলে যে কেবল নিজের জীবনের সদগতি হবে তা নয়। একাদশী পালন করা ব্যক্তির প্রয়াত পিতা/মাতা যদি নিজ কর্ম দোষে নরকবাসী হন, তবে সেই পুত্রই (একাদশী ব্রত) পিতা–মাতাকে নরক থেকে উদ্ধার করতে পারে। একাদশীতে অন্ন ভোজন করলে যেমন নরকবাসী হবে, অন্যকে ভোজন করালেও নরকবাসী হবে।

একাদশী পারণঃ (একাদশী তিথির পরদিন উপবাস ব্রত ভাঙার পর নিয়ম) পঞ্জিকাতে একাদশী পারণের (উপবাসের পরদিন সকালে) যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া থাকে, সেই সময়ের মধ্যে পঞ্চ রবিশস্য ভগবানকে নিবেদন করে, প্রসাদ গ্রহণ করে পারণ করা একান্ত দরকার। নতুবা একাদশীর কোন ফল লাভ হবে না। একাদশী ব্রত পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল উপবাস করা নয়, নিরন্তর শ্রীভগবানের নাম স্মরণ, মনন, ও

শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে একাদশীর দিন অতিবাহিত করতে হয় । এদিন যতটুকু সম্ভব উচিত । একাদশী পালনের পরনিন্দা, পরচর্চা, মিথ্যা ভাষণ, ক্রোধ, দুরাচার, স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।

**বিঃ দ্রঃ** নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়ঃ — একাদশী ব্রতের আগের দিন রাত ১২ টার আগেই অন্ন ভোজন সম্পন্ন করে নিলে সর্বোত্তম। ঘুমানোর আগে দাঁত মাজা।

রাতে ব্রাশ করে দাঁত ও মুখগহবরে লেগে থাকা সব অন্ন পরিষ্কার করে নেওয়া সর্বোত্তম। সকালে উঠে শুধু মুখ কুলি ও স্নান করতে হয়।

একাদশীতে সবজি কাটার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন কোথাও কেটে না যায়। একাদশীতে রক্তক্ষরণ বর্জনীয়। দাঁত মাজার সময় অনেকের রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। তাই একাদশীর আগের দিন রাতে দাঁত ভালোভাবে মেজে নেওয়াই সমীচীন।

একাদশীতে চলমান একাদশীর মাহাত্ম্য ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখ হতে শ্রবণ অথবা সম্ভব না হলে নিজেই ভক্তি সহকারে পাঠ করতে হয়।

যারা একাদশীতে একাদশীর প্রসাদ রান্না করেন, তাদের পাঁচফোড়ন ব্যবহারে সতর্ক থাকা উচিৎ, কারণ পাঁচফোড়নে সরিষার তৈল ও তিল থাকতে পারে যা বর্জনীয়।

একাদশীতে শরীরে প্রসাধনী ব্যবহার নিষিদ্ধ। তৈল (শরীরে ও মাথায়) সুগন্ধি, সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি বর্জনীয়।

সকল প্রকার ক্ষৌরকর্ম — দাড়ি-গোঁফ করা এবং চুল ও নখ কাটা নিষিদ্ধ।

## একাদশীর আবির্ভাব

পদ্মপুরাণে একাদশী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। একসময় জৈমিনি ঋষি তাঁর গুরুদেব মহর্ষি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গুরুদেব! একাদশী কি? একাদশীতে কেন উপবাস করতে হয়? একাদশী ব্রত করলে কি লাভ? একাদশী ব্রত না করলে কি ক্ষতি? এ সব বিষয়ে আপনি দয়া করে বলুন।

মহর্ষি ব্যাসদেব তখন বলতে লাগলেন-সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর ভগবান এই জড় সংসারে স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করলেন। মর্ত্যলোকবাসী মানুষদের শাসনের জন্য একটি পাপপুরুষ নির্মাণ করলেন। সেই পাপপুরুষের অঙ্গগুলি বিভিন্ন পাপ দিয়েই নির্মিত হল। পাপপুরুষের মাথাটি ব্রহ্মহত্যা পাপ দিয়ে, চক্ষুদুটি মদ্যপান, মুখ স্বর্ণ অপহরণ, দুই কর্ণ-গুরুপত্নী গমন, দুই নাসিকা-স্ত্রীহত্যা, দুই বাহু-গোহত্যা পাপ, গ্রীবা-ধন অপহরণ, গলদেশ-ভ্রুণহত্যা, বক্ষ-পরস্ত্রী-গমন,উদর-আত্মীয়স্বজন বধ, নাভি-শরণাগত বধ, কোমর-আত্মশ্লাঘা, দুই উরু-গুরুনিন্দা, শিশ্ন-কন্যা বিক্রি, মলদ্বার-গুপ্তকথা প্রকাশ পাপ, দুই পা-পিতৃহত্যা, শরীরের রোম-সমস্ত উপপাতক।

এভাবে বিভিন্ন সমস্ত পাপ দ্বারা ভয়ঙ্কর পাপপুরুষ নির্মিত হল। পাপপুরুষের ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণু মর্ত্যের মানব জাতির দুঃখমোচন করবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন গরুড়ের পিঠে চড়ে ভগবান চললেন যমরাজের মন্দিরে। ভগবানকে যমরাজ উপযুক্ত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে যথাবিধি তাঁর পূজা করলেন। যমরাজের সঙ্গে কথোপকথনকালে ভগবান শুনতে পেলেন দক্ষিণ দিক থেকে অসংখ্য জিবের আর্তক্রন্দন ধ্বনি। প্রশ্ন করলেন-এ আর্তক্রন্দন কেন?

যমরাজ বললেন, হে প্রভু, মর্ত্যের পাপী মানুষেরা নিজ কর্মদোষে নরকযাতনা ভোগ করছে। সেই যাতনার আর্ত চীৎকার শোনা যাচ্ছে। যন্ত্রণাকাতর পাপাচারী জীবদের দর্শন করে করুণাময় ভগবান চিন্তা করলেন-আমিই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেছি, আমার সামনেই ওরা কর্মদোষে দুষ্ট হয়ে নরক যাতনা ভোগ করছে, এখন আমিই এদের সদগতির ব্যবস্থা করব। ভগবান শ্রীহরি সেই পাপাচারীদের সামনে একাদশী তিথি রূপে এক দেবীমুর্তিতে প্রকাশিত হলেন। সেই পাপীদেরকে একাদশী ব্রত আচরণ করালেন। একাদশী ব্রতের ফলে তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ বৈকুন্ঠ ধামে গমন করল।

শ্রীব্যাসদেব বললেন, হে জৈমিনি! শ্রীহরির প্রকাশ এই একাদশী সমস্ত সুকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ট এবং সমস্ত ব্রতের মধ্যে উত্তম ব্রত। কিছুদিন পরে ভগবানের সৃষ্ট পাপপুরুষ এসে শ্রীহরির কাছে করজোড়ে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগল-হে ভগবান! আমি আপনার প্রজা! আমাকে যারা আশ্রয় করে থাকে, তাদের কর্ম অনুযায়ী তাদের দুঃখ দান করাই আমার কাজ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি একাদশীর প্রভাবে আমি কিছুই করতে পারছি না, বরং ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি। কেননা একাদশী ব্রতের ফলে প্রায় সব পাপাচারীরা বৈকুন্ঠের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে।

হে ভগবান, এখন আমার কি হবে? আমি কাকে আশ্রয় করে থাকব? সবাই যদি বৈকুন্ঠে চলে যায়, তবে এই মর্ত্য জগতের কি হবে? আপনি বা কার সঙ্গে এই মর্ত্যে ক্রীড়া করবেন? পাপপুরুষ প্রার্থনা করতে লাগল- হে ভগবান, যদি আপনার এই সৃষ্ট বিশ্বে ক্রীড়া করবার ইচ্ছা থাকে তবে, আমার দুঃখ দুর করুন। একাদশী তিথির ভয় থেকে আমাকে রক্ষা করুন। হে কৈটভনাশন, আমি একমাত্র একাদশীর ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করছি। মানুষ, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ, জল-স্থল, বন-প্রান্তর, পর্বত-সমুদ্র, বৃক্ষ, নদী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সর্বত্রই আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু একাদশীর প্রভাবে কোথাও নির্ভয় স্থান পাচ্ছি না দেখে আজ আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

হে ভগবান, এখন দেখছি, আপনার সৃষ্ট অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ডের মধ্যে একাদশীই প্রাধান্য লাভ করেছে, সেইজন্য আমি কোথাও আশ্রয় পেতে পারছি না। আপনি কৃপা করে আমাকে একটি নির্ভয় স্থান প্রদান করুন। পাপপুরুষের প্রার্থনা শুনে ভগবান শ্রীহরি বলতে লাগলেন- হে পাপপুরুষ! তুমি দুঃখ করো না। যখন একাদশী তিথি এই

ত্রিভুবনকে পবিত্র করতে আবির্ভুত হবে, তখন তুমি অন্ন ও রবিশস্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তা হলে আমার মূর্তি একাদশী তোমাকে বধ করতে পারবে না।

## একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য

ভদ্রশীলের কাহিনীঃ পুরাকালে গালব নামে এক মহান মুনি নর্মদা নদীর তীরে বাস করতেন। তাঁর ভদ্রশীল নামে এক বিষ্ণুভক্ত পুত্র ছিল। সে ছোটবেলা থেকে বিষ্ণুমূর্তি বানিয়ে পূজা করত। বালক হয়েও লোককে বিষ্ণুপূজার উপদেশ ও একাদশী পালন করতে নির্দেশ দিত, নিজেও পালন করত। পিতা একাদিন জিজ্ঞাসা করেন। আচ্ছা ভদ্রশীল! তুমি অতি ভাগ্যবান। তুমি বলো তো, রোজ শ্রীহরির পূজা করা, একাদশ তিথি পালন করা- এরূপ ভক্তি কিভাবে তোমার উদয় হল?”

উত্তরে ভদ্রশীল বলতে লাগল- বাবা! আমি পূর্বজন্মের কথা ভুলিনি। আগের জন্মে যমপুরীতে গিয়েছিলাম। সেখানে যমরাজ আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ করেছিলেন। পিতা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন- ভদ্রশীল, তুমি পূর্বে কে ছিলে? যমরাজ তোমাকে কি বলেছিল, সব কিছুই আমাকে বলো। ভদ্রশীল বলল- বাবা! আমি পূর্বে চন্দ্রবংশের একা রাজা ছিলাম। তখন আমার নাম ছিল ধর্মকীর্তি।

ভগবান দত্তাত্রেয় আমার গুরু ছিলেন। নয় হাজার বছর আমি পৃথিবী শাসন করেছিলাম। বহু ধর্ম-কর্ম করেছিলাম। পরে যখন আমার অনেক ধনসম্পদ হল তখন আমি পাগলের মতো অধর্ম করতে লাগলাম। কতগুলি পাষন্ড ব্যক্তির সেঙ্গ আলাপ করতাম। আর কেবল কথা আলাপের ফলেই আমার বহু দিনের অর্জিত পুণ্য নষ্ট হয়ে গেল। আমিও পাষন্ডী হলে গেলাম। সব প্রজারাও অধর্ম করতে লাগল। প্রজাদের প্রত্যেকের অধর্মের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকেই গ্রহণ করতে হয়। তারপর একদিন আমি সৈন্যদের সঙ্গে বনে মৃগয়া করতে গেলাম।

বহু পশু বধ করলাম। তারপর আমি ক্ষুধঅ তৃষ্ণায় কাতর ও ক্লান্ত হয়ে রেবা নদীর তীরে গেলাম। প্রখর রোদে তপ্ত হয়ে নদীতে স্নান করলাম। কিন্তু তারপর আমার কোন সেনাকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত হলাম। অন্ধকার হয়ে এল। আমি পথ ঠিক করতে পারলাম না। তারপর এক জায়গায় গিয়ে কয়েকজন তীর্থবাসীকে দেখলাম। জানলাম তারা একাদশী ব্রত করেছে। তারা সারাদিন কিছু খায়নি, জলপান পর্যন্তও করেনি। আমি তাদের সঙ্গে পড়ে রাত্রি জাগরণ করলাম। কিন্তু ক্লান্তি ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে রাত্রি জাগরণের পর আমার মৃত্যু হল।

তখন দেখলাম বড় বড় দাঁত বিশিষ্ট দুজন ভয়ংকর যমদুত এসে আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। আর ক্লেশময় পথ দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলল। তারপর যমপুরীতে পৌছালাম। যমরাজও দেখতে তখন ভয়ংকর। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে ডেকে আমাকে দেখিয়ে বললেন-পন্ডিত! এই ব্যক্তির যেরূপ শিক্ষাবিধান তুমি তা বলো। চিত্রগুপ্ত

কিছুক্ষণ বিচার করে ধর্মরাজ যমকে বললেন-হে ধর্মপাল! এই ব্যক্তি পাপকর্মেই রত ছিল সত্য, কিন্তু তবুও একাদশীর উপবাসের জন্য সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে।

তীর্থবাস ও রাত্রি-জাগরণও করেছে। তাই ওর সব পাপ নষ্ট হয়েছে। চিত্রগুপ্ত এই কথা বললে যমরাজ খুব চমকে উঠলেন, তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভুমিতে দন্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে আমাকে পূজা করতে লাগলেন। তারপর তাঁর দূতদের আহ্বান করে বলতে লাগলেন- হে দূতগণ! তোমরা ভাল করে আমার কথা শোনো। তোমাদের মঙ্গলজনক কথা আমি বলছি। যে সব মানুষ মর্ধরত, তোমরা তাদেরকে এখানে আনবে না। যাঁরা শ্রীহরির ভক্ত, পবিত্র, একাদশীব্রত পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁদের মুখে সর্বদা 'হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে কৃষ্ণ, হে হরি, উচ্চারিত হয়, যাঁরা সকল লোকের হিতকারী ও শান্তিপ্রিয়, তাদেরকে তোমরা দূর থেকেই পরিত্যাগ করবে।

কারণ, সেই সব ব্যক্তিকে আমার শিক্ষা দেবার অধিকার নেই। যাঁরা সর্বদা হরিনামে আক্ত, সর্বদা হরিকথা শ্রবণে আগ্রহী, যাঁরা পাষন্ডগণের সঙ্গ করে না, ভক্তদের শ্রদ্ধা করে, সাধুসেবা অতিথিসেবা পরায়ণ, তাঁদেরকে পরিত্যাগ করবে।

হে দূতগণ! তোমরা শুধু তাদেরকেই আমার কাছে ধরে আনবে যারা উগ্রস্বভাব, ভক্তদের অনিষ্ট করে, লোকদের সঙ্গে কলহ বাধায়, একাদশী ব্রত পালনে একান্ত পরাঙ্‌মুখ, পরনিন্দুক, ব্রাহ্মণের ধনে লোভ, পরতন্ত্র, হরিভক্তি বিমূখ, যারা ভগবদ্ বিগ্রহ দেখে শ্রদ্ধাবত হয় না, মন্দির দর্শনে যাদের আগ্রহ নেই, অন্যের অপবাদ করে বেড়ায়, তাদের সবাইকে বেঁধে এখানে নিয়ে আসবে।'

যমরাজের মুখে এসব কথা শুনে আমি পাপকর্মের জন্য অত্যন্ত অনুশোচনা করতে থাকি। তারপর আমি সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেহ লাভ করলাম। একটি দিব্য বিমানে চড়িয়ে আমাকে যমরাজ দিব্যলোকে পাঠিয়ে দিলেন। কোটি কল্প সেখানে অবস্থান করার পর এই পৃথিবীতে এসে সদাচারী মহান ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার জাতিস্মরতা হেতু এসব ঘটনা আমার হৃদয়ে জাগ্রত আছে।

আমি পূর্বে একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য জানতাম না। অনিচ্ছাকৃতভাবে যখন একাদশী পালনে এত ফল লাভ করেছি। তাহলে ভক্তি সহকারে একাদশী ব্রত উপবাস করলে কি প্রকার ফল লাভ হয় তা জানি না। তাই বৈকুন্ঠধামে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছায় আমি পবিত্র একাদশীব্রত ও প্রতিদিন বিষ্ণুপূজা করব এবং অন্যদেরও এসব পালন করতে উৎসাহী করব। পুত্রের কথা শুনে গালব মুন অতি সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, আমার বংশে এই পরম বিষ্ণুভক্তের জন্ম হয়েছে, তাই আমার জন্ম সফল, আমার বংশও পবিত্র হল।

## একাদশীর পারণ মন্ত্র

*একাদশ্যাং নিরাহারো ব্রতেনানেন কেশব।প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব।।*

– এই মন্ত্র পাঠ করে নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে পালন করতে হয়।

একাদশীর উপবাস-দিন নির্ণয়-বিভ্রান্তি ও সমাধান
একাদশী, জন্মাষ্টমী আদি মাধব তিথিতে উপবাস থাকা সনাতন ধর্মীয় বিধির এক বিশেষ অঙ্গ। বৈদিক শাস্ত্রে বহুকাল পূর্ব থেকেই তা পালনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু তিথি অনুযায়ী ব্রত দিবস নির্ধারণে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত বা স্মার্ত আদি বিভিন্ন সম্প্রদায় ভেদে সমাজে আজ নানা বিভ্রান্তি। কেউ বলেন-"একাদশী তিথি আজ, রাতে তো অষ্টমী তিথি, কাল নবমীতে কেন অভিষেক-উপবাস করব?" ইত্যাদি। এত মতভেদ কীভাবে এবং কেন সৃষ্টি হলো সে বিষয়ে আলোচনা রচনার কলেবর বৃদ্ধি বিবেচনায় তা সংক্ষিপ্তকারে উপস্থাপনসহ প্রবন্ধে বিশেষত ব্রত দিবস নির্ণয়ে বিভ্রান্তি নিরসণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো।

## বৈষ্ণব স্মৃতিই পালনীয় কেন?(একাদশী)

মহাভাগবত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য.২৪/৩২৪-৩৪৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তদানীন্তন গৌড়াধিপতির প্রধানমন্ত্রী শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করে বৈষ্ণব স্মৃতি-গ্রন্থ (হরিভক্তিবিলাস) সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে একাদিক্রমে গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, বিভিন্ন মন্ত্রাদির বর্ণনা, বিভিন্ন উপাচারে শ্রীবিগ্রহ অর্চন, শ্রীমূর্তি লক্ষণ, শালগ্রাম, ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গাদির বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় দিকমাত্র উল্লেখ করেন। সেসব বিষয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা ২৪তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য একাদশ্যাদির বিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টমী বিধি বিচারণ।।
একাদশী জন্মাষ্টমী বামন দ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহ চতুর্দশী।।

এসব পূন্য তিথি উদযাপনের নির্দেশ দিয়ে মহাপ্রভু এর একটি বিশেষ বিধি উল্লেখ করেন-

এইসবে বিদ্ধা ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।

অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন।।
অর্থাৎ, “একাদশীতে অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাগ এবং অন্যব্রতে সূর্যোদয় বিদ্ধা ত্যাগ করে অবিদ্ধা ব্রত পালনে ভক্তি লাভ হয়।” এরপর মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন, যে- “এভাবে আমি সূত্র করে দিগদর্শন করলাম। তুমি যখন লিখবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে সমস্ত তত্ত্ব স্ফুরণ করবে।”
এই সংক্ষেপে সূত্র কহিলুঁ দিগদরশন।
যবে তুমি লিখিবা কৃষ্ণ করাবে স্মরণ।।- (চৈ.চ.মধ্য ২৪/৩৪৫)

এ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, “শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুপরম্পরার আশীর্বাদ ব্যতীত পারমার্থিক বিষয়ে লেখা যায় না। মহাজনদের আশীর্বাদের প্রভাবেই সেই কার্য সম্পাদন করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।”
মাহপ্রভুর আশীর্বাদপুষ্ট নির্দেশে পরবর্তীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ বিভিন্ন শাস্ত্র-উদ্‌বৃতিসহ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া শ্রীল গোপাল ভট্র গোস্বামী নিজে ‘সৎক্রিয়াসার দীপিকা’ ও ‘সংস্কার দীপিকা’ নামক পৃথক দু’টি গ্রন্থে দশবিধ সংস্কারের বিবিধ মাঙ্গলিক ক্রিয়াদির বিধি লিপিবদ্ধ করেন। তাই পরম্পরাভুক্ত প্রামাণিক উৎসস্বরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মূলত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কর্তৃক রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী বৈষ্ণবগণ মূলত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কর্তৃক রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি অনুসরণ করেন। উপরিউক্ত স্মৃতি গ্রন্থাদি রচনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে অবৈষ্ণব-স্মৃতিলেখক বন্দ্যঘটীয় শ্রীরঘুনন্দন মহাশয় ‘অষ্টবিংশতি-তত্ত্ব’ নামক স্মৃতিপ্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। তেমনি দেখা যায়, কমলাকর ভট্র রচিত ‘নির্ণয় সিন্ধু’, ‘ব্যবস্থাসর্বস্ব’ প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যবস্থাপত্র। এসব গ্রন্থের ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রচলিত অধিকাংশ পঞ্জিকা প্রস্তুত করা হয়।

যার ফলে বিভিন্ন ব্রত ও উৎসাবাদি তিথি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এসব গ্রন্থেরও বহু পূর্বে শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্যের ‘নৃসিংহ পরিচর্যা’, শ্রীকেশব ভট্রের ‘স্মৃতি-নিবদ্ধ’, ‘ভবদেব পদ্ধতি’ প্রভৃতি গ্রন্থ বর্তমান ছিল। আর ‘হরিভক্তিবিলাস’ গ্রন্থের কথাতো আগেই বলা হয়েছে। স্মার্তপন্থীগণ সেসব গন্থে বিধৃত সিদ্ধান্তের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেন না।এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, স্মার্ত কারা? স্মার্ত মানে স্মৃতিবিৎ (যিনি স্মৃতি শাস্ত্র জানেন)। তাহলে বৈষ্ণবগণ কি স্মৃতি মানেন না? বৈষ্ণবগণ অবশ্যই স্মৃতি শাস্ত্র স্বীকার করেন।

কিন্তু পার্থক্য একটি মাত্র স্থানে। ব্যবহারকুশল স্মার্তগণ শাস্ত্র বর্ণিত বিবিধ বিধান পালন করেন নিজ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাত্মক চতুঃবর্গ সাধনের জন্য, আর পরমার্থ কুশল বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট নিমিত্ত সকল বিধান পালন করেন নিজ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাত্মক চতুঃবর্গ সাধনের জন্য, আর পরমার্থ কুশল বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট নিমিত্ত

সকল বিধান অনুসরণ করেন।বেদান্তে প্রকৃতিবাদে কোনো পার্থক্য নেই। জীব যখন দেহে ও মনে আত্মবৃদ্ধি করতে নিজে ফলভোগীকামী হয়ে বিভিন্ন সৎক্রিয়াদি নিষ্পন্ন করে, তখন সে প্রাকৃত স্মার্ত বলে অভিহিত হয়।

তাই তাদের গ্রন্থের সাথে বৈষ্ণবস্মৃতির বিভিন্ন মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। তাদের সংকলিত বিবিধ সিদ্ধান্ত পরমার্থ নিষ্ঠার শিথিলতা জ্ঞাপক। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও গৌড়ীয় আচার্যদের অন্তর্ধানের কিয়ৎকাল পরে ক্রমান্বয়ে বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থাদি দুষ্প্রাপ্য হতে থাকে। এদিকে পরমার্থ শাস্ত্র ব্যবহারের অভাবে স্মার্তাচারই বৈষ্ণবাচারে অনধিকার প্রবেশ করতে থাকে। পরমেশ্বরজ্ঞানে বহুদেবদেবী পূজন, প্রেতশ্রাদ্ধ, বিদ্ধা একাদশী পালন প্রভৃতি বিচারে বৈষ্ণবস্মৃতির সাথে অবৈষ্ণবস্মৃতির বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়।

সেই দুরাবস্থা অপনোদনে সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুচেষ্টায় ‘সৎক্রিয়াসারদীপিকা’ ও ‘হরিভক্তিবিলাস’ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ভিত্তিক পঞ্জিকা আধুনিক যন্ত্রে মুদ্রণের ব্যবস্থা করে বৈষ্ণবস্মৃতি পুনরায় প্রচলন করতে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন। সেই ধারায় বর্তমানে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ ধৃত প্রমাণাদি বিচার সাপেক্ষ ‘বৈষ্ণব পঞ্জিকা’ প্রকাশ করে আসছ। বৈষ্ণব আচার্যের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে স্মার্তচার পালন, স্বরূপ বিস্মৃতির পরিচায়ক। তাই আত্মমঙ্গলের জন্য সকলের উচিত বৈষ্ণব স্মৃতি অনুসরণ করা।

**একাদশী উপবাস দিন নির্ণয়**

একাদশীর উপবাস দিন নির্ণয় প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে (১২/১৯৯) দুই প্রকার একাদশীর কথা বলা হয়েছে-

১. সম্পূর্ণা বা শুদ্ধা একাদশী ও

২. বিদ্ধা একাদশী

এছাড়াও অষ্টমহাদ্বাদশী ব্রতের কথাও শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। বিদ্ধা একাদশী কি এবং এরূপ একাদশী করা উচিত কি উচিত নয়, সে সম্পর্কে তিনটি মত আমরা দেখতে পাই। (ক) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত, (খ) নিম্বাক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মত এবং (গ) স্মার্ত মত। একাদশী ব্রত উদযাপন প্রসঙ্গে প্রখানে কেবল ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দর্শন তুলে ধরা হলো।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে একাদশীঃ ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে বৈষ্ণবগণ অরুণোদয় বিদ্ধা অর্থাৎ দশমী বিদ্ধা একাদশী তে ব্রত করেন না। এ বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থসগ বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্র এবং ঋষিবাক্য উদ্‌ধৃত করা যায়ঃ। তার আগে আমাদের অরুণোদয় সময় বলতে কী বুঝায় তা বুঝতে হবে।

১ মুহুর্ত বলতে ৪৮ মিনিট বুঝায়। আর এক দন্ড বলতে ২৪ মিনিট। সুতরাং ৪ দন্ড=২ মুহুর্ত বা ৯৬ মিনিট বা ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট। শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে-

উদয়াৎ প্রাক চতস্রস্থ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ।
তত্র স্নানাং প্রশস্ত স্যাৎ স বৈ পুন্যতমঃ স্মাচতঃ।।(হ.ভ.বি. ১২/৩৪২) অর্থাৎ "সূর্যোদয়ের পূর্বের চার দন্ড সময়কে (দুই মুহুর্ত) অরুণোদয় বলে। ঐ কাল অতি পুন্যতম। প্রাতস্নায়ী ব্যক্তির ঐ সময় স্নান করা প্রশস্ত।" পাঠকের সুবিধার্থে নীচে উদাহরণ দিয়ে অরুণোদয় সময়কাল বুঝানো হলোঃ

*সূর্যোদয়ের ১.৩৭ মি: পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বলা হয় অরুণোদয়। ধরুন, ৫.৩৭ মি. সূর্যোদয়; এর ১.৩৬মি. পূর্বের সময় হলো ৪.০০টা, সুতরাং ৪.০০-৫.৩৭ মি.- পর্যন্ত সময় হলো অরুণোদয়। এই সময়ের মধ্যে যদি দশমী তিথি স্পর্শ করে, তবে তাকে বলা হয় দশমী বিদ্ধা একাদশী।*

## বিদ্ধা একাদশী বর্জন প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় প্রমাণ

এ প্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত গরুড় পুরাণ ও শিবরহস্যে বলা হয়েছে- 'উদয়াৎ প্রাক যদা বিপ্র মুহুর্তদ্বয়সংযুতা। সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদগৃহী।।(হ.ভ.বি. ১২/৩১৬)- অর্থাৎ, হে বিপ্র, সূর্যদয়ের পূর্বে দুই মুহুর্ত ( ৪৮×২=৯৬ মিনিট অর্থাৎ ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট) ব্যাপী একাদশী থাকলে, তাকে সম্পূর্ণা একাদশী বলে। এ দিনেই উপবাস করা বিধেয়। ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে-

আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাড়মুহূর্তদ্বয়ান্বিতা। একাদশী তু সম্পূর্ণা

বিদ্ধান্যা পরিকীর্তিতা।। অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে।

দশম্যৈকাদশীবিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ।।(হ.ভ.বি.১২/৩১৭-৩১৮)

অর্থাৎ যদি সূর্যোদয়ের দুই মুহূর্ত অর্থাৎ চারদন্ড পূর্ব থেকে একাদশী আরম্ভ হয়, তাহলে ঐ একাদশীকে সম্পূর্ণা বলে। সূর্যোদয়ের পূর্বে চার দন্ডের কম সময় একাদশী থাকলে বিদ্ধা বা দশমী সংযুক্ত একাদশী বর্জন করবে। বৈষ্ণবের পক্ষে দশমী সংযুক্ত একাদশী সর্বদা পরিত্যাজ্য।

অরুণোদয়কালে দশমী যদি দৃশ্যতে। পাপমূলং তদা

জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনাম।।(হ.ভ.বি.১২/৩৪৯)

-অরুণোদয়কালে যদি দশমী দৃষ্ট হয়, ঐদিন একাদশী উপবাসকারীগণের উপবাস পাপের কারণ বলে জানবে। পাদ্মপুরাণ, উত্তরখন্ডে বলা হয়েছে-

অরুণোদয়বেলায়ং দশমীমিশ্রিতা ভবেৎ। তাং ত্যক্তা দ্বাদশীং

শুদ্ধামুপোষ্যেদবিচারয়ন্।।(হ.ভ.বি. ১২/৩৩৪)

-অরুণোদয় বেলাতে যদি দশমী মিশ্রিত হয়, তা ত্যাগপূর্বক বিচার না করেই শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করবে। সুতরাং, একাদশী দিবসে অরুণোদয়কালে দশমী স্পর্শ হলে, তাকে দশমী বিদ্ধা একাদশী বলে। দশমী বিদ্ধা একাদশী বাদ দিয়ে দ্বাদশী সংযুক্তা একাদশী ব্রত পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করলে পাপ হয় না। কেননা গরুড়পুরান, পদ্মপুরাণ, স্কন্ধপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণাদি শাস্ত্রানুযায়ী এটাই বিধি।

উপর্যুক্ত গ্রন্থসহ বিভিন্ন ঋষি এবং পুরাণ শাস্ত্রের বচন অনুসরণে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ কখনো অরুণোদয় বা দশমী বিদ্ধা একাদশী ব্রত পালন করেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেছেন, অরূণোদয়বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা যায়- এভাবে যেসব বচন আছে সেগুলো অবৈষ্ণবপর বুঝতে হবে। অর্থাৎ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশীতে বৈষ্ণব কখনো উপবাস করবেন না। ঐসব বচন শ্রক্রমায়াকল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রচলিত পঞ্জিকাগুলোতে (যেগুলো মূলত স্মার্তমত অনুযায়ী লেখা) দশমী বিদ্ধা হলেও একাদশীর ব্যবস্থা আছে এবং পাশাপাশি পরদিন বৈষ্ণবদের জন্য একাদশীর কথা বলা হয়েছে। এজন্য যারা স্মার্ত মতে বিশ্বাসী, তারা এই বিষয়ে আজও কথাটি উল্লেখ করে থাকেন। কখনো কখনো ইসকন প্রকাশিত পঞ্জিকায় উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে বাইরের পঞ্জিকার সময়ের অমিল দেখা যায়। সেক্ষেত্রে, প্রামাণিক উৎস হিসেবে ইসকন অনুসারীগণ নিদ্বির্ধায় ইসকন প্রকাশিত পঞ্জিকা অনুযায়ীই ব্রত পালন করে থাকেন।

## বিদ্ধা একাদশী পালনের ফল

শ্রীগরুড় পুরাণের পূর্বখন্ডে একাদশী মহাত্ম্য প্রসঙ্গে ১২৫ তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- ব্রহ্মা বললেন, প্রাচীনকালে মান্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি একাদশীতে উপবাস করার ফলস্বরূপ সসাগরা ধরার একমাত্র অধীশ্বর হয়েছিলেন; অতএব শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে কেউ ভোজন করবে না। গান্ধারী দশীসংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করেছিলেন, এজন্য গান্ধারীর শত পুত্র বিনষ্ট হয়; অতএব দশমীযুক্তা একাদশীতে অসুর সন্নিহিত থাকে, দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে হরি সন্নিহিত থাকেন; তবে নানাবিধ শাস্ত্রের বাক্য-বিরোধ দেখে সন্দেহ উপস্তিত হলে, অর্থাৎ একদিনেই যদি

দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীর যোগ হয়, তবে তখন দ্বাদশীতে উপবাস করে ত্রয়োদশীতে পারণ করবে।

যদি দ্বাদশী দিনে এক কলা মাত্র একাদশীও থাকে, তবুও দ্বাদশী দিনেই উপবাস করা কর্তব্য। যেদিন একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের শিশ্রণ হয়, সে দিনে উপবাস করলে সর্বপ্রকার পাপ নাশ হয়। যেদিন শুদ্ধ একাদশী থাকে, সে দিনেই উপবাস করা কর্তব্য, কিংবা দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতেও উপবাস করতে পারে; অথবা যদি একদিন একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের মিলন হয়, তবে উপবাস করবে, কিন্তু কখনো দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস করবে না। রাত্রি জাগরণ, পুরাণশ্রবণ ও গদাধরের (বিষ্ণুর) অর্চনা করে একাদশীর উপবাস করবে; রুক্মাঙ্গদ রাজা এরূপ একাদশীতে উপবাস করে মোক্ষপদ পেয়েছিলেন।

## মহাদ্বাদশী ব্রত

কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুদ্ধা একাদশী (বিদ্ধা নয়) ত্যাগ করেও দ্বাদশীতে একাদশী ব্রত করতে হয়। শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার (শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী) অনেক শাস্ত্র পর্যালোচনা করে এরুপ কয়েকটি শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীতে ব্রত করার স্থল দেখিয়েছেন। স্কন্ধ পুরাণে লিখিত আছে-

একাদশী যদা পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।

তদা হেক্যাদশীং ত্যক্তা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ।।

অর্থাৎ অরুণোদয় পূর্ব থেকে আরম্ভ হয়ে সর্ম্পূর্ণা একাদশী হলে এবং দ্বাদশী সম্পূর্ণা হয়ে পরের দিন ত্রয়োদশীতে কিছু মাত্র থাকলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীতে উপবাস করা উচিত। এরূপ ৮টি দ্বাদশীতে উপবাস করতে হয়। এদের বলা হয় অষ্টমহাদ্বাদশী। এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীসূত-শৌনক সংসবাদে বলা হয়েছে-
উন্মীলনী ব্যঞ্জলী ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী। জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।।

দ্বাদশ্যোহষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্বপাহরা দ্বিজ।

তিথিযোগেন জায়তে চতস্রশ্চাপরাস্তথা।

নক্ষত্রযোগাচ্চ কলাৎ পাপং পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ।। (হ.ভ.বি.১৩/২৬৫-২৬৬)

"হে দ্বিজ, উন্মীলনী, ব্যঞ্জলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী-এই আটটি মহাদ্বাদশী পরম পবিত্রা ও সর্বাপাপহারিণী। এর মধ্যে প্রথম তিথিযোগে এবং অবশিষ্ট চারটি নক্ষত্রযোগে আবির্ভূত হয়। এ সকল দ্বাদশী সর্বপাপ বিনাশ করে।"

**প্রসঙ্গত :** ১. একাদশী সম্পূর্ণ হয়ে পরের দিন দ্বাদশীতে কলামাত্র বৃদ্ধি পেলে অথচ দ্বাদশীর পরের দিন বৃদ্ধি না পেলে তাকে 'উন্মীলনী' দ্বাদশী বলা হয়।(স্কন্দপুরাণ)। ২. সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে একাদশী পূর্ণ হলে এবং দ্বাদশীও পূর্ণ হয়ে তার পরের দিন ত্রয়োদশী এরূপ মিশ্রিত তিথি হলে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলে। (কূর্ম পুরাণ)। ৪. অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা সম্পূর্ণ হয়ে প্রতিপদে কিছুমাত্র থাকলে তার পূর্বের দ্বাদশী তিথির নাম পক্ষবর্ধিনী। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ) এই চারটি মহাদ্বাদশী কেবল তিথির ক্ষয়বৃদ্ধি অনুসারে সংঘটিত হয়।

আবার দ্বাদশীর সাথে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রযোগে আরো চারটি মহাদ্বাদশী ব্রতের কথা হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ৫. শুক্লপক্ষের দ্বাদশতে পুনর্বসু নক্ষত্র যুক্ত হলে তাকে সর্বোত্তমা 'জয়া' মহাদ্বাদশী বলা হয়। ৬. শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হলে সেই মহা পবিত্র দ্বাদশীকে 'বিজয়া' বলা হয়। ৭. শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হলে সেই পবিত্র দ্বাদশীকে 'জয়ন্তী' বলা হয়। ৮.শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হলে সেই দ্বাদশীকে 'পাপনাশিনী' বলা হয়।

পুণ্যশ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী-সংযুতাস্থ তাঃ। উপোষিতাঃ সমাফলা

দ্বাদশ্যোহষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।।(হ.ভ.বি. ১৩/২৭১)

অর্থাৎ দ্বাদশীর সাথে পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্বসু এবং রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হলে যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপনাশিনী এই চারটি মহাদ্বাদশী হয়। একই গ্রন্থে বলা হয়েছে যদি দ্বাদশীর সাথে পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্বসু এবং রোহিণী ন্ক্ষত্রের সূর্যোদয় কাল থেকে যোগ হয় এবং ঐ সব নক্ষত্র দ্বাদশী অপেক্ষা অধিক, দ্বাদশীর সমান অথবা দ্বাদশী অপেক্ষা কম সময়কাল স্থায়ী হয়, তবে ঐ দ্বাদশীতে মহাদ্দাদশীব্রত হবে। বিকল্পভাবে সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে নক্ষত্র আরম্ভ হয়ে যদি দ্বাদশীর সমানকাল অথবা বেশি কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহলেও মহাদ্বাদশী ব্রত হবে। এছাড়াও শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী যদি একাদশী এবং দ্বাদশী শ্রবণ নক্ষত্র স্পর্শ করে তবে ঐ একাদশীর দিন উপবাস না হয়ে দ্বাদশীর দিন উপবাস হবে। অষ্টমহাদ্বাদশী বৈষ্ণবগণ কখনো পরিত্যাগ করবেন না।

পদ্মপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে বলা হয়েছে যে, যারা এই দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করে না, দেহান্তে তারা যমপুরীতে বাস করে। তাই আত্মকল্যাণ লাভের জন্য প্রত্যেকের কর্তব্য একাদশী তথা মহাদ্বাদশী তিথিগুলো যত্ন সহকারে পালন করা। এর ফলে অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়। এছারাও হরিভক্তিবিলাসে শ্রাবণ দ্বাদশী এবং গোবিন্দ দ্বাদশী নামে আরো দুটি দ্বাদশী ব্রতের উল্লেখ রয়েছে।

# জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমীর ক্ষেত্রেও বিদ্ধা-অবিদ্ধা বিচার কর্তব্য। কেউ কেউ মনে করেন-"অরুণোদয় দশমীবিদ্ধা হলে একাদশী যেমন বর্জিতা হয়, তেমনি অরুণোদয়ে সপ্তমী বিদ্ধা হলে জন্মাষ্টমী ত্যাজ্যা" কিন্তু এটা সুসঙ্গত নয়। কারণ, একাদশী ছাড়া অন্য তিথিসকল সুর্যোদয়ের আরম্ভ হলে সম্পূর্ণা লক্ষণ হয়। সম্পূর্ণা তিথিতে বিদ্ধত্বারোপ মূঢ়তার পরিচয় মাত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-আচার্য প্রবর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'প্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থে( ৮ম প্রমেয়-৯ শ্লোকে) স্পষ্টভাবে লিখেছেন-

"অরুণোদয়বিদ্ধস্থ সংত্যাজ্য হরিবাসরঃ।

জন্মাষ্টমীং পূর্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জয়েৎ।।(হ.ভ.বি.১৫/৩৬১)

"দশমী বিদ্ধা একাদশী শ্রবণ্য নক্ষত্রা যুক্তা হইলেও যেমন বর্জনীয়া, সেইরূপ রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা হইলেও সূর্যোদয় সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবে।"

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য লীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ৩৩৭ পয়ারের অনুভাষ্যে লিখেছেন-"একাদশীতে অরুণোদয়বিদ্ধা ত্যাগ এবং অন্য ব্রতে সুর্যোদয়বিদ্ধা ত্যাগ করে অবিদ্ধাব্রতই পালনীয়। বিদ্ধাব্রত পালনে 'দোষ' এবং অবিদ্ধাব্রত পালনেই ভক্তি হয়।" কেউ কেউ বলেন, পরবিদ্ধা অর্থাৎ কেবল নবমীযুক্তা অষ্টমীতেই জন্মাষ্টমীর উপবাস করতে হবে, এটাও ভ্রম।

সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগ করে নবমীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করতে হবে সন্ধেহ নাই, কিন্তু যে স্থলে অষ্টমীতে সপ্তমীবিদ্ধা নেই অর্থাৎ সপ্তমীতে সূর্যোদয় স্পর্শ হয়নি, সে স্থলে শুদ্ধা অষ্টমীতেই উপবাস করতে হবে। যদি অষ্টমী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরের দিনও কিছুকাল থাকে, তাহলে পরেরদিন অষ্টমীর শেষে পারণ করতে হবে, এই প্রকার স্পষ্ট নির্দেশ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আছে। সকলক্ষেত্রেই মাত্র নবমীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাসের ব্যবস্থা থাকলে পারণের পূর্বোক্ত ব্যবস্থা হতো না। পূর্ববিদ্ধা পরিত্যাগ করে শুদ্ধা তিথিতে উপবাসই সাধারণত সর্বত্র দৃষ্ট হয়। জন্মাষ্টমী প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত আছে,-

"উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি। ভবতো বুধসংযুক্তা

প্রাদপ্রত্যক্ষ-সংযুতা। অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন বা বিভো।।

(হ.ভ.বি ১৫/৩৫২)

সূর্যোদয়কালে কিঞ্চিৎমাত্র অষ্টমী থেকে সমস্ত দিনরাত্র নবমী হলে এবং তাতে বুধবার ও রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হলে, তাকে অতি দুর্লভ জানতে হবে। হে বিভো, এরূপ যোগ শত বৎসরেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

ইন্দুঃ পূর্বেহহনি জ্ঞে বা পরে চেদরোহিণী-যুতা। কেবলা চাষ্টমী বৃদ্ধা

সোপোষ্যা নবমী যুতা।।(হ.ভ.বি.১৫/৩৫৪)

পূর্ব দিন যদিও সোমবার কি বুধবার হয়, কিন্তু শুক্লা অষ্টমী যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরদিন রোহিণীর সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে পরদিন নবমীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করবে। কিন্তু পূর্ব ও পর উভয় দিন যদি শুদ্ধাঅষ্টমীর সাথে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ থাকে, তাহলে যে দিন মধ্যরাত্রিতে রোহিণী থাকবে, সেই দিন উপবাস হবে। আর যদি উভয় দিনে মধ্যরাত্রিতে রোহিণী থাকে, তাহলে পূর্বদিন উপবাস হবে।

# সকলএকাদশী ব্রত মাহাত্ম্য

## বরুথিনী একাদশী

বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষীয়া বরুথিনী একাদশী ব্রত মহাত্ম্য ভবিষ্যোত্তর পুরাণে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে বর্ণনা করা হয়েছে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন- হে বাসুদেব! আপনাকে প্রণাম। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী কি নামে প্রশিদ্ধ এবং তার মহিমাই বা কি তা কৃপা করে আমাকে বলুন।শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে রাজন! ইহলোক ও পরলোকে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী 'বরুথিনী' নামে বিখ্যাত। এই ব্রত পালনে সর্বদা সুখ লাভ হয় এবং পাপক্ষয় ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটে।

দুর্ভাগা স্ত্রীলোক এই ব্রত পালনে সর্বসৌভাগ্য লাভ করে থাকে। ভক্তি ও মুক্তি প্রদানকারী এই ব্রত পালনে সর্বসৌভাগ্য লাভ করে থাকে। ভক্তি ও মুক্তি প্রদানকারী এই ব্রত সর্বপাপহরণ এবং গর্ভবাস যন্ত্রণা বিনাশ করে। এই ব্রত প্রভাবে মান্ধাতা, ধুন্ধুমার আদি রাজারা দিব্যধাম লাভ করেছেন।

এমনকি মহাদেব শিবও এই ব্রত পালন করেছিলেন। দশ হাজার বৎসর তপস্যার ফল কেবলমাত্র এক বরুথিনী ব্রত পালনে লাভ হয়। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই ব্রত পালন করেন তিনি ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত প্রকার বাঞ্চিত ফল লাভ করেন।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অশ্বদান অপেক্ষা গজদান শ্রেষ্ঠ, গজদান থেকে ভূমিদান, তা থেকে তিলদান, তিলদান থেকে স্বর্ণদান এবং তা অপেক্ষাও অন্নদান শ্রেষ্ঠ। অন্নদানের মতো শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। পিতৃলোক, দেবলোক ও মানুষেরা অন্নদানেই পরিতৃপ্ত হন।

পন্ডিতেরা কন্যাদানকে অন্নদানের সমান বলে থাকেন। স্বয়ং ভগবান গোদানকে অন্নদানের সমান বলেছেন। আবার এই সমস্ত প্রকার দান থেকেও বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ে এই বরুথিনী ব্রত পালনে সেই বিদ্যাদানের সমান ফল লাভ হয়ে থাকে। পাপমতি যে সব মানুষ কন্যার উপার্জিত অর্থে জীবনধারণ করে, পুণ্যক্ষয়ে তাদের নরকযাতনা ভোগ করতে হয়। তাই কখনও কন্যার উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়।
যে ব্যক্তি বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার সহ কন্যাদান করেন তাঁর পুণ্যের হিসাব স্বয়ং চিত্রগুপ্তও করতে অসমর্থ হন। কিন্তু 'বরুথিনী' ব্রত পালনকারী কন্যাদান থেকেও বেশি ফল লাভ করে।

ব্রতকারী ব্যক্তি দশমীর দিনে কাঁসার পাত্রে ভোজন, মাংস, মসুর, ছোলা, শাক, মধু, অন্যের প্রদত্ত অন্নগ্রহণ, দুইবার আহার ও মৈথুন পরিত্যাগ করবে।

দ্যুতক্রীড়া, নেশাজাতীয় দ্রব্য, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা- পরচর্চা, প্রতারণা, চুরি, হিংসা, মৈতুন, ক্রোধ ও মিথ্যাবাক্য একাদশীর দিনে বর্জনীয়। কাঁসার পাত্রে ভোজন, মাংস, মসুর, মধু, তেল, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, দুইবার আহার ও মৈথুন এসব দ্বাদশীর দিনে পরিত্যাজ্য।

হে রাজন! এই বিধি অনুসারে বরুথিনী ব্রত পালনে সকল প্রকার পাপের বিনাশ এবং অক্ষয়গতি লাভ হয়। যিনি হরিবাসরে রাত্রিজাগরণ করে ভগবান জনার্দনের পূজা করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করেন।
তাই সূর্যপুত্র যমরাজের যাতনা থেকে পরিত্রাণের জন্য পরম যত্নে এই একাদশী ব্রত পালন করা কর্তব্য। বরুথিনী একাদশীর ব্রতকথা শ্রদ্ধাভরে পাঠ বা শ্রবণ করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় এবং সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

## মোহিনী একাদশী

কুর্মপুরাণে বৈশাখ শুক্লপক্ষের ‘মোহিনী’ একাদশীর ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন- ‘হে জনার্দন! বৈশাখ শুক্লপক্ষীয় একাদশীর কি নাম, কি ফল, কি বিধি- এসকল কথা আমার নিকট বর্ণনা করুন।’

উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে ধর্মপুত্র! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রও বশিষ্ঠের কাছে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন।
তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন- হে মুনিবর! আমি জনকনন্দিনী সীতার বিরহজনীত কারণে বহু দুঃখ পাচ্ছি। তাই একটি উত্তম ব্রতের কথা আমাকে বলুন। যার দ্বারা সর্বপাপ ক্ষয় ও সর্বদুঃখ বিনষ্ট হয়।

এই কথা শুনে বশিষ্ঠদেব বললেন- হে রামচন্দ্র! তুমি উত্তম প্রশ্ন করেছ। যদিও তোমার নামগহ্রহণেই মানুষ পবিত্র হয়ে থাকে। তবুও লোকের মঙ্গলের জন্য তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম পবিত্র একটি ব্রতের কথা বলছি।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী ‘মোহিনী’ নামে প্রসিদ্ধা। এই ব্রত প্রভাবে মানুষের সকল পাপ, দুঃখ ও মোহজাল অচিরেই বিনষ্ট হয়। তাই মানুষের উচিত সকল পাপক্ষয়কারী ও সর্বদুঃখবিনাশী এই একাদশী ব্রত পালন করা। একাগ্রচিত্তে তার মহিমা তুমি শ্রবণ কর। এই কথা শ্রবণমাত্রেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

পবিত্র সরস্বতী নদীর তীরে ভদ্রাবতী নামে এক সুশোভনা নগরী ছিল। চন্দ্রবংশজাত ধৃতিমান নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। সেই নগরীতেই ধনপাল নামে এক বৈশ্য বাস করতেন।

তিনি ছিলেন পুণ্যকর্মা ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি। তিনি নলকূপ, জলাশয়, উদ্যান, মঠ ও গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করে দিতেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। সুমনা, দ্যুতিমান, মেধাবী, সুকৃতি ও ধৃষ্টবুদ্ধি নামে তার পাঁচজন পুত্র ছিল। পঞ্চম পুত্র ধৃষ্টবুদ্ধি ছিল অতি দুরাচারী। সে সর্বদা পাপকার্যে লিপ্ত থাকত।
পরস্ত্রী সঙ্গী, বেশ্যাসক্ত, লম্পট ও দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতি পাপে সে অত্যন্ত আসক্ত ছিল। দেবতা, ব্রহ্মণ ও পিতামাতার সেবায় তার একেবারেই মতি ছিল না। সে অন্যায়কার্যে রত, দুষ্টস্বভাব ও পিতৃধন ক্ষয়কারক ছিল। সবসময় সে অভক্ষ ভক্ষণ ও সুরাপানে মত্ত থাকত।
পিতা ধনপাল একদিন পথ চলছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ধৃষ্টবুদ্ধি এক বেশ্যার গলায় হাত রেখে নিঃসকোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার নির্লজ্জ পুত্রকে এভাবে চৌরাস্তায় ভ্রমণ করতে দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এই কুস্বভাব দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাকে গৃহ থেকে বার করে দিলেন।
তার আত্মীয়-স্বজনও তাকে পরিত্যাগ করল। সে তখন নিজের অলংকারাদি বিক্রি করে জীবন অতিবাহিত করত। কিছুদিন এইভাবে চলার পর অর্থাভাব দেখা দিল। ধনহীন দেখে সেই বেশ্যাগণও তাকে পরিত্যাগ করল।
অন্নবস্ত্রহীন ধৃষ্টবুদ্ধি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। অবশেষে নিজের গ্রামে সে চুরি করতে শুরু করল। একদিন রাজপ্রহরী তাকে ধরে বন্দী করল। কিন্তু পিতার সম্মানার্থে তাকে মুক্ত করে দিল।
এভাবে বারকয়েক সে ধরা পড়ল ও ছাড়া পেল। কিন্তু তবুও সে চুরি করা বন্ধ করল না। তখন রাজা তাকে কারাগারে বদ্ধ করে রাখলেন। বিচারে সে কষাঘাত দন্ডভোগ করল। কারাভোগের পর অনন্য উপায় ধৃষ্টবুদ্ধি বনে প্রবেশ করল। সেখানে সে পশুপাখি বধ করে তাদের মাংস ভক্ষণ করে অতি দুঃখে পাপময় জীবন যাপন করতে লাগল। দুষ্কর্মের ফলে কেউ কখনও সুখী হতে পারে না। তাই সে ধৃষ্টবুদ্ধি দিবারাত্রি দুঃখশোকে জর্জরিত হল। এভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হল। কোন পুণ্যফলে সহসা একদিন সে কৌণ্ডিন্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হল।
বৈশাখ মাসে ঋষিবর গঙ্গাস্নান করে আশ্রমের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। শোকাকুল ধৃষ্টবুদ্ধি তার সম্মুখে উপস্থিত হল। ঘটনাক্রমে ঋষির বস্ত্র হতে একবিন্দু জল তার গায়ে পড়ল। সেই জলস্পর্শে তার সমস্ত পাপ দূর হল। হঠাৎ তার শুভবুদ্ধির উদয় হল। ঋষির সামনে সে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করতে লাগল 'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! যে পূণ্য প্রভাবে আমি এই ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি, তা কৃপাকরে আমাকে বলুন।
'

ঋষিবর বললেন-'বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে মোহিনী নামে যে প্রসিদ্ধ একাদশী আছে, তুমি সেই ব্রত পালন কর। এই ব্রতের ফলে মানুষের বহু জন্মার্জিত পর্বত পরিমাণ পাপরাশিও ক্ষয় হয়ে থাকে। মহামুনি বশিষ্ঠ বললেন-কৌন্ডিণ্য ঋষির উপদেশ শ্রবণ করে প্রশন্ন চিত্তে ধৃষ্টবুদ্ধি সেই ব্রত পালন করল।হে মহারাজ রামচন্দ্র! এই ব্রত পালনে সে নিষ্পাপ হল। দিব্যদেহ লাভ করল। অবশেষে গরুড়ে আরোহন করে সকল প্রকার উপদ্রবহীন বৈকুন্ঠধামে গমন করল।

হে রাজন, ত্রিলোকে মোহিনী ব্রত থেকে আর শ্রেষ্ঠ ব্রত নেই। যজ্ঞ, তীর্থস্থান, দান ইত্যাদি কোন পূণ্যকর্মই এই ব্রতের সমান নয়। এই ব্রত কথার শ্রবণ কীর্তনে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

## অপরা একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন- হে কৃষ্ণ! জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি এবং তার মাহাত্ম্যই বা কি, আমি শুনতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করে তার মাহাত্ম্যই বা কি, আমি শুনতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করে তা বর্ণনা করুন।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মহারাজ! মানুষের মঙ্গলের জন্য আপনি খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। বহু পুণ্য প্রদানকারী মহাপাপ বিনাশকারী ও পুত্রদানকারী এই একাদশী 'অপরা' নামে খ্যাত।
এই ব্রত পালনকারী ব্যক্তি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, ভ্রুণহত্যা, পরনিন্দা, পরস্ত্রীগমন, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি গুরুতর পাপ এই ব্রত পালনে নষ্ট হয়ে যায়।

যারা মিথ্যাসাক্ষ্যদান করে, ওজন বিষয়ে ছলনা করে, শাস্ত্রের মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রদান করে, জ্যোতিষের মিথ্যা গণনা ও মিথ্যা চিকিৎসায় রত থাকে, তারা সকলেই নরকযাতনা ভোগ করে।
এসমস্ত ব্যক্তিরাও যদি এই ব্রত পালন করে, তবে তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়, তবে সে ঘোরতর নরকগামী হয়। কিন্তু সেও এই ব্রত পালনে মুক্ত হয়ে স্বর্গগতি লাভ করে।

মকররাশিতে সূর্য অবস্থানকালে মাঘ মাসে প্রয়াগ স্নানে যে ফল লাভ হয়; শিবরাত্রিতে কাশীধামে উপবাস করলে যে পুণ্য হয়; গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিন্ডদানে যে ফল পাওয়া যায়; সিংহরাশিতে বৃহস্পতির অবস্থানে গৌতমী নদীতে স্নানে, মুস্তে কেদারনাথ দর্শনে, বদরিকাশ্রম-যাত্রায় ও বদ্রীনারায়ণ সেবায়; সুর্যগ্রহণে কুরক্ষেত্রে স্নানে, হাতি, ঘোড়া, স্বর্ণ তানে এবং দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সম্পাদনে যে ফল লাভ হয়, এই ব্রত পালন করলে অনায়াসে সেই সকল ফল লাভ হয়ে থাকে।

এই অপরা ব্রত পাপরূপ বৃক্ষের কুঠার স্বরূপ, পাপরূপ কাষ্ঠের দাবাগ্নির মতো, পাপরূপ অন্ধকারের সূর্যসদৃশ এবং পাপহস্তির সিংহস্বরূপ। এই ব্রত পালন না করে যে ব্যক্তি জীবন ধারণ করে জলে বুদবুদের মতো তাদের জন্ম-মৃত্যুই কেবল সার হয়।অপরা একাদশীতে উপবাস করে বিষ্ণুপূজা করলে সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। এই ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণ করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মান্ডপুরাণে এই ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

## পান্ডবা নির্জলা একাদশী

জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষের এই নির্জলা একাদশী ব্রত সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীভীমসেন-ব্যাসসংবাদে বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন- হে জনার্দন! আমি অপরা একাদশীর সমস্ত মাহাত্ম্য শ্রবণ করলাম এখন জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্য কৃপাপূর্বক আমার কাছে বর্ণনা করুন।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই একাদশীর কথা মহর্ষি ব্যাসদেব বর্ণনা করবেন। কেননা তিনি সর্বশাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব পূর্ণরূপে জানেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বললেন- হে মহর্ষি দ্বৈপায়ন! আমি মানুষের লৌকিক ধর্ম এবং জ্ঞানকান্ডের বিষয়ে অনেক শ্রবণ করেছি। আপনি যথাযথভাবে ভক্তিবিষয়িনী কিছু ধর্মকথা এখন আমায় বর্ণনা করুন।
শ্রীব্যাসদেব বললেন- হে মহারাজ! তুমি যেসব ধর্মকথা শুনেছ এই কলিযুগের মানুষের পক্ষে সে সমস্ত পালন করা অত্যন্ত কঠিন। যা সুখে, সামান্য খরচে, অল্প কষ্টে সম্পাদন করা যায় অথচ মহাফল প্রদান করে এবং সমস্ত শাস্ত্রের সারস্বরূপ সেই ধর্মই কলিযুগে মানুষের পক্ষে করা শ্রেয়। সেই ধর্মকথাই এখন আপনার কাছে বলছি।

উভয় পক্ষের একাদশী দিনে ভোজন না করে উপবাস ব্রত করবে। দ্বাদশী দিনে স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে নিত্যকৃত সমাপনের পর শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করবে। এরপর ব্রাহ্মণদেরকে প্রসাদ ভোজন করাবে। অশৌচাদিতেও এই ব্রত কখনও ত্যাগ করবে না।

যে সকল ব্যক্তি স্বর্গে যেতে চায়, তাদের সারা জীবন এই ব্রত পালন করা উচিত। পাপকর্মে রত ও ধর্মহীন ব্যক্তিরাও যদি এই একাদশী দিনে ভোজন না করে, তবে তারা যমযাতনা থেকে রক্ষা পায়।
শ্রীব্যাসদেবের এসব কথা শুনে গদাধর ভীমসেন অশ্বত্থ পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন- হে মহাবুদ্ধি পিতামহ! মাতা কুন্তী, দ্রৌপদী, ভ্রাতা যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এরা কেউই একাদশীর দিনে ভোজন করে না। আমাকেও অন্ন গ্রহণ করতে নিষেধ করে। কিন্তু দঃসহ ক্ষুধাযন্ত্রণার জন্য আমি উপবাস করতে পারি না।

ভীমসেনের এরকম কথায় ব্যাসদেব বলতে লাগলেন- যদি স্বর্গাদি দিব্যধাম লাভে তোমার একান্ত ইচ্ছা থাকে, তবে উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করবে না ।

তদুত্তরে ভীমসেন বললেন- আমার নিবেদন এই যে, উপবাস তো দুরের কথা, দিনে একবার ভোজন করে থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ আমার উদরে 'বৃক' নামে অগ্নি রয়েছে। ভোজন না করলে কিছুতেই সে শান্ত হয় না। তাই প্রতিটি একাদশী পালনে আমি একেবারেই অপারগ।

হে মহর্ষি! বছরে একটি মাত্র একাদশী পালন করে যাতে আমি দিব্যধাম লাভ করতে পারি এরকম কোন একাদশীর কথা আমাকে নিশ্চয় করে বলুন।

তখন ব্যাসদেব বললেন- জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে জলপান পর্যন্ত না করে সম্পূর্ণ উপবাস থাকবে। তবে আচমনে দোষ হবে না। ঐদিন অন্নাদি গ্রহণ করলে ভ্রত ভঙ্গ হয়।

একাদশীর দিন সূর্যোদয় থেকে দ্বাদশীর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জলপান বর্জন করলে অনায়াসে বারোটি একাদশীর ফল লাভ হয়। বছরের অন্যান্য একাদশী পালনে অজান্তে যদি কখনও ব্রতভঙ্গ হয়ে যায়, তা হলে এই একটি মাত্র একাদশী পালনে সেই সব দোষ দূর হয়। দ্বাদশী দিনে বাহ্মমুহূর্তে স্নানাদিকার্য সমাপ্ত করে শ্রীহরির পূজা করবে। সদাচারী ব্রাহ্মণদের বস্ত্রাদি দানসহ ভোজন করিয়ে আত্মীয়স্বজন সঙ্গে নিজে ভোজন করবে। এরূপ একাদশী ব্রত পালনে যে প্রকার পূণ্য সঞ্চিত হয়, এখন তা শ্রবণ কর।

সারা বছরের সমস্ত একাদশীর ফলই এই একটি মাত্র ব্রত উপবাসে লাভ করা যায়। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলেছেন- 'বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে যারা একমাত্র আমার শরণাপন্ন হয়ে এই নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করে তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়।

বিশেষত কলিযুগে ধন-সম্পদ দানের মাধ্যমে সদগতি বা স্মার্ত সংস্কারের মাধ্যমেও যথার্থ কল্যাণ লাভ হয় না। কলিযুগে দ্রব্যশুদ্ধি নেই। কলিতে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বিশুদ্ধ হয় না। তাই বৈদিক ধর্ম কখনও সুসম্পন্ন হতে পারে না।

হে ভীমসেন! তোমাকে বহূ কথা বলার আর প্রয়োজন কি? তুমি উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করবে না। যদি তাতে অসমর্থ হও তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে অবশ্যই নির্জলা উপবাস করবে। এই একাদশী ব্রত ধনধান্য ও পুন্যদায়িনী। যমদূতগণ এই ব্রত পালনকারীকে মৃত্যুর পরও স্পর্শ করতে পারে না। পক্ষান্তরে বিষ্ণুদুতগণ তাঁকে বিষ্ণুলোকে নিয় যান।

শ্রীভীসেন ঐদিন থেকে নির্জলা একাদশী পালন করতে থাকায় এই একাদশী 'পান্ডবা নির্জলা বা ভীমসেনী একাদশী' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এই নির্জলা একাদশীতৈ পবিত্র তীর্থে স্নান, দান, জপ, কীর্তন ইত্যাদি যা কিছু মানুষ করে তা অক্ষয় হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই একাদশী মহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন।

## যোগিনী একাদশী

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদরূপে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠির বললেন- হে বাসুদেব! আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী মাহাত্ম্য কৃপাপূর্বক আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মহারাজ! সকল পাপবিনাশিনী ও মুক্তপ্রদ এই উত্তম ব্রতের কথা বলছি, আপনি শ্রবণ করুন। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী 'যোগিনী' নামে খ্যাত।

মহাপাপ নাশকারী এই তিথি ভবসাগরে পতিত মানুষের উদ্ধার লাভের একমাত্র নৌকাস্বরূপ। ব্রত পালনকারীদের পক্ষে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলে প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আপনাকে একটি পবিত্র পৌরাণিক কাহিনী বলছি।

অলকা নগরে শিবভক্ত পরায়ণ কুবের নামে এক রাজা ছিল। তিনি প্রত্যহ শিবপূজা করতেন। তার হেমমালী নামে একজন মালী ছিল। প্রতিদিন শিব পূজার জন্য মানস সরোবর থেকে সে ফুল তুলে যক্ষরাজ কুবেরকে দিত। বিশালাক্ষী নামে হেমমালীর এক পরমা রূপবতী পত্নী ছিল।

সে তার সুন্দরী পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল। একদিন সে তার স্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ল। রাজভবনে যাওয়ার কথাও ভুলে গেল। বেলা দুই প্রহর অতীত হল। অর্চনের সময় চলে যাচ্ছে দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হলেন। মালীর বিলম্বের কারণ অনুসন্ধানে এক দূত প্রেরণ করলেন।

দূত এসে রাজাকে বলল- 'সে গৃহে স্ত্রীর সাথে আনন্দে মত্ত। দূতের কথা শুনে কুবের অত্যন্ত রেগে তখনি মালীকে তার সামনে হাজির করতে আদেশ দিল। এদিকে মালী কুবেরের পূজার সময় অতিবাহিত হয়েছে বুঝতে পেরে অত্যন্ত ভয় পেল। তাই স্নান না করেই সে রাজার কাছে উপস্থিত হল।

তাকে দেখামাত্র রাজা ক্রোধবশে চোখ রাঙিয়ে বললেন- রে পাপিষ্ঠ, দুরাচার! তুই দেবপূজার পুষ্প আনতে অবজ্ঞা করেছিস তাই আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি তুই শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হয়ে যা এবং তোর প্রিয়তমা ভার্যার সাথে তোর চিরবিয়োগ সংগঠিত হোক। রে নীচ, তুই এখনি এই স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধোগতি লাভ কর।

কুবেরের এই অভিশাপে হেমমালী পত্নীর সাথে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ কুষ্ঠরোগ ভোগ করতে লাগল। রোগের যন্ত্রণায় দিন অথবা রাত্রে কখনই সে সুখ পেত না। এভাবে শীত গ্রীষ্মে প্রচন্ড বেদনায় বহুকষ্টে সে জীবনযাপন করতে লাগল। কিন্তু দীর্ঘদিন মহাদেবের অর্চনের ফুল সংগ্রহের সুকৃতি ফলে সে শাপগ্রস্ত হয়েও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবের বিস্মরণ কখনও হয়নি।

একদিন হেমমালী ভ্রমণ করতে করতে হিমালয়ে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হল। কুষ্ঠরোগে পীড়িত সপত্নী হেমমালীকে দর্শন করে শ্রীমার্কণ্ডেয় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-'তুমি কার অভিশাপে এইরকম নিন্দনীয় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়েছ?'

সে উত্তর দিল- 'হে মনিবর! রাজা ধনকুবেরের আমি ভৃত্য ছিলাম। আমার নাম হেমমালী। আমি প্রত্যহ মানস সরোবর থেকে ফুল তুলে শিব পূজার জন্য রাজাকে দিতাম।
কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন স্ত্রীর মনোরঞ্জন হেতু কামাসক্ত হওয়ায় সেই ফুল দিতে বিলম্ব হয়। রাজার অভিশাপে এইরকম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি। পরোপকারই মাধুগণের স্বাভাবিক কর্ম। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি অত্যন্ত অপরাধী। কৃপা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।
তখন দয়ার্দ্র চিত্ত মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন- হে মালী! তোমার মঙ্গলের জন্য শুভফল প্রদানকারী এক ব্রতের উপদেশ করছি। তুমি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের 'যোগিনী' নামক একাদশী ব্রত পালন কর। এই ব্রতের পুণ্য প্রভাবে তুমি অবশ্যই কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্ত হবে।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন- ঋষির উপদেশ শ্রবণ করে হেমমালী তাকে প্রণাম জানাল। পরে অত্যন্ত আনন্দে ঋষির আদেশমতো নিষ্ঠার সঙ্গে যোগিনী একাদশী ব্রত পালন করল। এইভাবে হেমমালী সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হল ও পত্নীসহ সুখে জীবনযাপন করতে লাগল।হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমি আপনার কাছে এই ব্রত উপবাসের মহিমা কীর্তন করলাম। এই ব্রত পালনে অষ্টাশি হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই মহাপাপ বিনাশকারী ও পুন্যফল প্রদায়ী যোগিনী একাদশীর কথা পাঠ এবং শ্রবণ করে সে অচিরেই সর্বপাপ থেকে মুক্ত হবে।

## শয়ন একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন- 'হে কৃষ্ণ! আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি? এর মহিমাই বা কি? তা আমাকে কৃপা করে বলুন।'
শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ব্রহ্মা এই একাদশী সম্পর্কে দেবর্ষি নারদকে যা বলেছিলেন আমি সেই আশ্চর্যজনক কথা আপনাকে বলছি। শ্রীব্রহ্মা বললেন- হে রানদ! এ সংসারে একাদশীর মতো পবিত্র আর কোন ব্রত নেই।
সকল পাপ বিনাশের জন্য এই বিষ্ণুব্রত পালন করা একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি এই প্রকার পবিত্র পাপনাশক এবং সকল অভিষ্ট প্রদাতা একাদশী ব্রত না করে তাকে নরকগামী হতে হয়।
আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের এই একাদশী 'শয়নী' নামে বিখ্যাত। শ্রীভগবান ঋষিকেশের জন্য এই ব্রত পালন করতে হয়। এই ব্রতের সম্বন্ধে এক মঙ্গলময় পৌরাণিক কাহিনী আছে। আমি এখন তা বলছি।
বহু বছর পূর্বে সূর্যবংশে মান্ধাতা নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং প্রতাপশালী চক্রবর্তী রাজা। প্রজাদেরকে তিনি নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করতেন।

সেই রাজ্যে কোনরকম দুঃখ, রোগ-ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, আতঙ্ক, খাদ্যাভাব অথবা কোন অন্যায় আচরণ ছিল না। এইভাবে বহুদিন অতিবাহিত হল।
কিন্তু একসময় হঠাৎ দৈবদুর্বিপাকে ক্রমাগত তিনবছর সে রাজ্যে কোন বৃষ্টি হয়নি। দুর্ভিক্ষের ফলে সেখানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে দানমন্ত্রের 'স্বাহা' 'স্বধা' ইত্যাদি শব্দও বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি বেদপাঠও ক্রমশ বন্ধ হল।
তখন প্রজারা রাজার কাছে এসে বলতে লাগল- মহারাজ দয়া করে আমাদের কথা শুনুন। শাস্ত্রে জলকে নার বলা হয় আর সেই জলে ভগবানের অয়ন অর্থাৎ নিবাস। তাই ভগবানের এক নাম নারায়ণ।
মেঘরূপে ভগবান বিষ্ণু সর্বত্র বারিবর্ষণ করেন। সেই বৃষ্টি থেকে অন্ন এবং অন্ন খেয়ে প্রজাগণ জীবন ধারণ করেন। এখন সেই অন্নের অভাবে প্রজারা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। অতএব হে মহারাজ আপনি এমন কোন উপায় অবলম্বন করুন যাতে আপনার রাজ্যের শান্তি এবং কল্যাণ সাধন হয়।
রাজা মান্ধাতা বললেন- তোমরা ঠিকই বলেছ। অন্ন থেকে প্রজার উদ্ভব। অন্ন থেকেই প্রজার পালন। তাই অন্নের অভাবে প্রজারা বিনষ্ট হয়। আবার রাজার দোষেও রাজ্য নষ্ট হয়। আমি নিজের বুদ্ধিতে আমার নিজের কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না। তবুও প্রজাদের কল্যাণের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।
তারপর রাজা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে সৈন্যসহ বনে গমন করলেন। সেখানে প্রধান প্রধান ঋষিদের আশ্রমে ভ্রমণ করলেন। এভাবে একদিন তিনি ব্রহ্মার পুত্র মহাতেজস্বী অঙ্গিরা ঋষির সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তাকে দর্শনমাত্রই রাজা মহানন্দে ঋষির চরণ বন্দনা করলেন। রাজা তখন তার বনে আগমনের কারণ সবিস্তারে ঋষির কাছে জানালেন।ঋষি অঙ্গিরা কিছু সময় ধ্যানস্থ থাকার পর বলতে লাগলেন- 'হে রাজন! এটি সত্যযুগ। এই যুগে সকল লোক বেদপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ তপস্যা করে না ।এই নিয়ম থাকা সত্ত্বেও এক শুদ্র ও রাজ্যে তপস্যা করছে। তার এই অকার্যের জন্যই রাজ্যের এই দুর্দশা। তাই তাকে হত্যা করলেই সকল দোষ দূর হবে।
রাজা বললেন- হে মুনিবর!
তপস্যাকারী নিরাপরাধ ব্যক্তিকে আমি কিভাবে বধ করব? আমার পক্ষে সহজসাধ্য অন্য কোন উপায় থাকলে আপনি তা দয়া করে আমাকে বলুন।তদুত্তরে মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন-আপনি আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের শয়নী নামে প্রসিদ্ধা একাদশী ব্রত পালন করুন। এই ব্রতের প্রভাবে নিশ্চয়ই রাজ্যে বৃষ্টি হবে। এই একাদশী সর্বসিদ্ধি দাত্রী এবং সর্ব উপদ্রব নাশকারিনী। হে রাজন! প্রজা ও পরিবারবর্গ সহ আপনি এই ব্রত পালন করুন।
মুনিবরের কথা শুনে রাজা নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন। আষাঢ় মাস উপস্থিত হলে রাজ্যের সকল প্রজা রাজার সাথে এই একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। ব্রত প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। কিছুকালের মধ্যেই অন্নাভাব দুর হল। ভগবান হৃষিকেশের কৃপায় প্রজাগণ সুখী হল।

এ কারণে সুখ ও মুক্তি প্রদানকারী এই উত্তম ব্রত পালন করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। ভবিষোত্তরপুরাণে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ তথা নারদ-ব্রহ্মা সংবাদ রূপে একাদশীর এই মহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

## কামিকা একাদশী

শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষীয়া কামিকা একাদশীর কথা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদে বলা হয়েছে।
যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন-হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম এবং মাহাত্ম্য সবিস্তারে আমার কাছে বর্ণনা করুন। তা শুনতে আমি অত্যন্ত কৌতুহলী।
প্রত্যুত্তরে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে রাজন! পূর্বে দেবর্ষি নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে এই প্রশ্ন  করলে তিনি যে উত্তর প্রদান করেছিলেন আমি এখন সেই কথাই বলছি। আপনি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন।
একসময় ব্রহ্মার কাছে ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ জিজ্ঞাসা করলেন- হে ভগবান! শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি, এর আরাধ্য দেবতা কে, সেই ব্রতের বিধিই বা কিরকম এবং এই ব্রতের ফলে কি পুণ্য লাভ হয় তা সবিশেষ জানতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করে আমাকে তা জানালে আমার জীবন ধন্য হবে।

শ্রীনারদের কথা শুনে ব্রহ্মা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন- হে বৎস! জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য আমি তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিচ্ছি, তুমি তা শ্রবণ কর।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী 'কামিকা'   নামে জগতে প্রসিদ্ধা। এই একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ভগবান শ্রীহরির পূজা-অর্চনা অপরিমিত পূর্ণ ফল প্রদান করে। গঙ্গা গোদাবরী কাশী নৈমিষ্যারণ্য পুষ্কর ইত্যাদি তীর্থ দর্শনের  সমস্ত ফল একমাত্র কৃষ্ণপূজার মাধ্যমে কোটিগুণ লাভ করা যায়।

সাগর ও অরণ্য যুক্ত পৃথিবী দানের ফল, দুগ্ধবতী গাভী দানের ফল অনায়াসে এই ব্রত পালনে লাভ হয়। যা া পাপপূর্ণ সাগরে নিমগ্ন এই ব্রতই তাদের উদ্ধারের একমাত্র সহজ উপায়।
এইরকম পবিত্র পাপনাশক শ্রেষ্ঠ ব্রত আর জগতে নেই। শ্রীহরি স্বয়ং এই মহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। রাত্রি জাগরণ করে যারা এই ব্রত পালন করেন তাঁরা কখনও দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হন না। এই ব্রত পালনকারী কখনও নিম্নযোনি প্রাপ্ত হন না।

কেশবপ্রিয়া তুলসীপত্রে যিনি শ্রীহরির পূজা করেন পদ্মপাতায়  জলের মতো তিনি পাপে নির্লিপ্ত থাকেন। তুলসীপত্র দিয়ে বিষ্ণুপূজায় ভগবান যেমন সন্তুষ্ট হন, মণিমুক্তাদি মূল্যবান রত্ন মাধ্যমেও তেমন প্রীত হন না।
যিনি কেশবকে তুলসীমঞ্জরী দিয়ে পূজা করেন তার জন্মার্জিত সমস্ত পাপক্ষয় হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বললেন- হে নারদ! যিনি তুলসীকে প্রত্যহ দর্শন করেন তার সকল পাপরাশি বিদুরিত হয়ে যায়,
যিনি তাঁকে স্পর্শ করেন তার পাপমলিন দেহ পবিত্র হয়, তাঁকে প্রণাম করলে সমস্ত রোগ দূর হয়, তাঁকে জল সিঞ্চন করলে যমও তার কাছে আসতে ভয় পান।
শ্রীহরিচরণে তুলসী অর্পিত হলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। তাই হে কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী তোমায় প্রণাম করি।
যে ব্যক্তি হরিবাসরে ভগবানের সামনে দীপদান করেন চিত্রগুপ্তও তাঁর পুণ্যের সংখ্যা হিসাব করতে পারে না। তার পিতৃপুরুষেরাও পরম তৃপ্তি লাভ করেন।শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে রাজন। আমি আপার কাছে সর্বপাপহারিনী কামিকা একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করলাম। অতএব যিনি ব্রহ্মহত্যা ভ্রূণহত্যা-পাপবিনাশিনী, মহাপুণ্যফলদায়ী এই ব্রত পালন করবেন ও এই মাহাত্ম্য শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ অথবা শ্রবণ করবেন তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করবেন।

## পবিত্রারোপণী একাদশী

একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে প্রভু! শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি তা কৃপা করে আমাকে বলুন।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মহারাজ! এখন আমি সেই পবিত্র ব্রত মহাত্ম্য বর্ণনা করছি, মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করুন। যা শোনামাত্রেই বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।
প্রাচীন কালে দ্বাপর যুগের শুরুতে মহিজীৎ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি মহিস্মতি নগরে রাজত্ব করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তার মনে বিন্দুমাত্র সুখ-শান্তি ছিল না। কেননা তিনি ছিলেন অপুত্রক।
পুত্রহীনের ইহলোকে পরলোক কোথাও সুখ হয় না’ - এইরূপ চিন্তা করতে করতে বহুদিন কেটে গেল। কিন্তু তবুও পুত্রমুখ দর্শনে রাজা বঞ্চিতই রহইলেন। নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা মনে করে রাজা চিন্তাগ্রস্থ হলেন।
প্রজাদের সামনে গিয়ে বলতে লাগলেন- হে প্রজাবৃন্দ! তোমরা শোন। আমি এই জন্মে তো কোন পাপকাজ করিনি, অন্যায়ভাবে আমার রাজকোষ বৃদ্ধি করিনি, ব্রাহ্মণ বা দেবতাদের সম্পদ কখনও গ্রহণ করিনি উপরন্তু প্রজাদেরকে পুত্রের মতো পালন করেছি, ধর্ম অনুযায়ী পৃথিবী শাসন করেছি।

দুষ্টদের যথানুরূপ দন্ড দিয়েছি, সজ্জন ব্যক্তিদের যথাযোগ্য সম্পান করতেও কখনও অবহেলা করিনি। তাই হে ব্রহ্মণগণ, এই প্রকার ধর্মপথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও কেন আমার পুত্র লাভ হল না, তা আপনারা কৃপা করে অনুসন্ধান করুন।
রাজার এই প্রকার কাতর উক্তি শ্রবণে ব্যথিত রাজভক্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ রাজার মঙ্গলের জন্য গভীর বনে ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষির কাজে যেতে মনস্থ করলেন। বনের মধ্যে ঋষিদের আশ্রমসকল দেখতে দেখতে তারা এক মুনির সন্ধান পেলেন।
তিনি দীর্ঘায়ু, নীরোগ, নিরাহারে ঘোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সর্বশাস্ত্র বিশারদ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ সেই মহামুনি লোমশ নামে পরিচিত। ব্রহ্মার এক কল্প অতিবাহিত হলে মুনিবরের গায়ের একটি লোম পরিত্যক্ত হোত।
এই কারণে এই মহামুনির নাম লোমশ। তাকে দেখে সকলেই ধন্য হলেন। তারা পরস্পর বলতে লাগলেন যে, আমাদের বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফলে আজ আমরা এই মুনিবরের সাক্ষাৎ লাভ করলাম।

তারপর ঋষিবর তাদের সম্বোধন করে বললেন- কি কারণে আপনারা এখানে এসেছেন এবং কেনই বা আমার এত প্রশংসা করেছেন, তা স্পষ্ট করে বলুন। আপনাদের যাতে মঙ্গল হয়, আমি নিশ্চয়ই তার চেষ্টা করব।
ব্রাহ্মণেরা বললেন- হে ঋষিবর! আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি আপনি তা কৃপা করে শুনুন। এ পৃথিবীতে আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কোথাও নেই। মহীজিৎ নামে এক রাজা নিঃসন্তান হওয়ায় অতি দুঃখে দিনযাপন করছে।
আমরা তার প্রজা, তিনি আমাদেরকে পুত্রের মতো পালন করেন। কিন্তু তিনি পুত্রহীন বলে আমরাও সবাই মর্মাহত। তার দুঃখ দূর করতে আমরা এই বনে প্রবেশ করেছি। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! রাজা যাতে পুত্রের মুখ দর্শন করতে পারেন, কৃপা করে তার কোন উপায় আমাদের বলুন।
তাদের কথা শুনে মুনিবর ধ্যানমগ্ন হলেন। কিছু সময় পরে রাজার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। এই রাজা পূর্বজন্মে এক দরিদ্র বৈশ্য ছিলেন। একবার তিনি একটি অন্যায় কার্য করে ফেলেন।
ব্যবসা করবার জন্য তিনি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করতেন। এক সময় জৈষ্ঠ্য মাসে শুক্লপক্ষের দশমীর দিনে কোথাও যাওয়ার পথে তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। গ্রাম প্রান্তে একটি জলাশয় তিনি দেখতে পান।
সেখানে জলপানের জন্য যান। একটি গাভী ও তার বাছুর সেখানে জলপান করছিল। তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি নিজেই জলপান করতে লাগলেন। এই পাপকর্মের ফলে তিনি পুত্রসুখে বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু পূর্বজন্মের কোন পূণ্যের ফলে তিনি এইরকম নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করেছেন।

হে মুনিবর! শাস্ত্রে আছে যে পুণ্য দ্বারা পাপক্ষয় হয়। তাই আপনি এমন একটি পুণ্যব্রতের উপদেশ করুন যাতে তার পারব্ধ পাপ দুর হয় এবং আপনার অনুগ্রহে তিনি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন।

লোমশ মুনি বললেন- শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পবিত্রারোপণী একাদশী ব্রত অভিষ্ট ফল প্রদান করে। আপনারা যথাবিধি তা সকলে পালন করুন।

লোমশ মুনির উপদেশ শুনে আনন্দ চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা রাজাকে সে সকল কথা জানালেন। তারপর সকলে মিলে মুনির নির্দেশ অনুসারে ব্রত পালন করলেন। তাদের সকলের পুণ্যফল রাজাকে প্রদান করলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবর্তী হলেন। উপযুক্ত সময়ে বলিষ্ঠ, সর্বাঙ্গসুন্দর এক পুত্রসন্তানের জন্ম দান করলেন।

ভবিষোত্তরপুরাণে এই মহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই ব্রত মাহাত্ম্য যিনি পাঠ বা শ্রবণ করবেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন এবং পুত্রসুখ ভোগ করে অবশেষে দিব্যধাম প্রাপ্ত হবেন।

## অন্নদা একাদশী

এই ভাদ্রবর্তী কৃষ্ণপক্ষীয়া অন্নদা একাদশীর মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন- হে কৃষ্ণ! ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম কি, তা শুনতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে রাজন! আমি সবিস্তারে এই একাদশীর কথা বর্ণনা করছি। আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন।

ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীকে বলা হয় ‘অন্নদা’ । এই তিথি সর্বপাপবিনাশিনী। যিনি শ্রীহরির অর্চনে এই ব্রত পালন করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হন। এমনকি এই ব্রতের নাম শ্রবণেই রাশি রাশি পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। এই ব্রত প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক ইতিহাস রয়েছে।

প্রাচীন কালে হরিশচন্দ্র নামে এক নিষ্ঠাপরায়ণ সত্যবাদী, চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। পূর্ব কর্মফল ও প্রতিজ্ঞার সত্যতা রক্ষায় তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হন। অবস্থা এমন হল যে, তিনি নিজের স্ত্রী-পুত্র এবং অবশেষে নিজেকেও পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হলেন।

হে রাজেন্দ্র! এই পুণ্যবান রাজা চন্ডালের দাসত্ব স্বীকার করেও সত্যরক্ষার্থে দৃঢ়নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি শ্মশানে মৃতব্যক্তির বস্ত্রও কর রূপে গ্রহণ করতেন। এইভাবে তাঁর বহু বছর কেটে গেল।

দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়ে ‘কি করি’ কোথায় যাই, কিভাবে এ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাই’ - এই চিন্তায় তিনি দিনরাত্রি বিভোর হলেন। এমন সময় দৈবক্রমে পরদুঃখদুঃখী গৌতম ঋষি রাজার কাছে এলেন। রাজা মুনিকে দর্শন করে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। করযোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একে একে নিজের সমস্ত কথা জানালেন। রাজার দুঃখের কথা শুনে মুনিবর বিস্ময়াপন্ন হলেন।

অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তিনি বললেন- ‘হে রাজন! ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী অন্নদা নামে জগতে প্রসিদ্ধ। আপনি এই ব্রত পালন করুন। এই ব্রতপ্রভাবে আপনার সমস্ত পাপের বিনাশ হবে। আপনার ভাগ্যবশত আগামী সাত দিন পরেই এই তিথির আবির্ভাব হবে। ঐ দিন উপবাস থেকে রাত্রি জাগরণ করবেন। এইভাবে ব্রত উদযাপনে আপনার সমস্ত পাপক্ষয় হবে। হে রাজন! আপনার পুণ্যপ্রভাবে আমি এখানে এসেছি জানবেন। এইকথা বলে গৌতম মুনি অন্তর্হিত হলেন।
ঋষিবরের উপদেশ মতো তিনি শ্রদ্ধা সহকারে সেই ব্রত পালন করলেন। তার ফলে তাঁর সমস্ত পাপ দূর হল। হে মহারাজ! এই ব্রতের প্রভাব শ্রবণ করুন। যথাবিধি এই ব্রত পালনে বহু বছরের দুঃখভোগের অবসান হয়। ব্রতের প্রভাবে রাজা হরিশ্চচন্দ্রের সকল দুঃখ সমাপ্ত হল। আকাশ থেকে দেবগণ দুন্দুভিবাদ্য ও পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। নিষ্কণ্টক রাজ্যসুখ ভোগ করে অবশেষে আত্মীয়-স্বজন ও নগরবাসী সহ স্বর্গে গমন করলেন।যে মানুষ নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত পালন করেন, তিনি শ্রীহরি চরণে ভক্তি লাভ করে অবশেষে দিব্যধামে গমন করেন। এই ব্রতের মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

## পার্শ্ব (পরিবর্তিনী) একাদশী

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের পার্শ্ব একাদশী মহাত্ম্য যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে এইরকম বলা হয়েছে।
যুধিষ্ঠির মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন-হে কৃষ্ণ! ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি? এই ব্রত পালনের বিধি কি এবং ব্রত পালনেই বা কি পুণ্য লাভ হয়?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে ধর্মরাজ! মহাপুণ্যপ্রদা, সমস্ত পাপহারিনী এবং মুক্তিদায়িনী এই একাদশী বাজপেয় যজ্ঞ থেকেও বেশি ফল দান করে। যে ব্যক্তি এই তিথিতে ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবামনদেবের পূজা করেন, তিনি ত্রিলোকে পূজিত হন।
পদ্মফুলে পদ্মলোচন শ্রীবিষ্ণুর অর্চনকারী বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। শায়িত ভগবান এই তিথিতে পার্শ্ব পরিবর্তন করেন। তাই এর পার্শ্ব একাদশী বা পরিবর্তিনী একাদশী।
যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন- হে জনার্দন! আপনার এসকল কথা শুনেও আমার সন্দেহ পূর্ণরূপে দুর হয়নি। হে দেব! আপনি কিভাবে শয়ন করেন, কিভাবেই বা পার্শ্ব পরিবর্তন করেন, আর চার্তুমাস্য ব্রত পালনকারীর কি কর্তব্য এবং আপনার শয়নকালে লোকের কি করণীয়?
এসব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাকে বলুন। আর কেনই বা দৈত্যরাজ বলিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তা বর্ণনা করে আমার সকল সন্দেহ দূর করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে রাজন! দৈত্যকুলে আবির্ভূত প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র 'বলি' আমার অতি প্রিয় ভক্ত ছিল। সে আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য গো-ব্রাহ্মণ পূজা ও যজ্ঞাদি ব্রত সম্পাদন করত।
কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষবশত সকল দেবলোক সে জয় করে নেয়। তখন দেবতাগণসহ ইন্দ্র আমার শরণাপন্ন হয়েছিল। তাদের প্রার্থনায় আমি বাহ্মণবালক বেশে বামনরূপে বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলাম।
তার কাছে আমি ত্রিপাদভূমিমাত্র প্রার্থনা করেছিলাম। সেই তুচ্ছবস্তু থেকে আরও শ্রেষ্ঠ কিছু সে আমাকে দিতে চাইলেও আমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণেই স্থির থাকলাম। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য আমাকে ভগবানরূপে জানতে পেরে বলিমহারাজকে ঐ দান দিতে নিষেধ করল।
কিন্তু সত্যাশ্রয়ী বলি গুরুর নির্দেশ অমান্য করে আমাকে দান দিতে সংকল্প করল। তখন আমি এক পদে নীচের সপ্তলোক, আরেক পদে উপরের সপ্তভুবন অধিকার করে নিলাম।
পুনরায় তৃতীয় পদের স্থান চাইলে সে তার মাথা পেতে দিল। আমি তার মস্তকে তৃতীয় পদ স্থাপন করলাম। তার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে আমি সর্বদা তার কাছে বাস করার প্রতিশ্রুতি দিলাম।
ভাদ্র শুক্লপক্ষীয়া একাদশীতে ভগবান শ্রীবামনদেবের এক মূর্তি বলি মহারাজের আশ্রমে স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মূর্তি ক্ষীর সাগরে অনন্তদেবের কোলে শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত চারমাস শয়ন অবস্থায় থাকেন। এই চারমাস যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট নিয়ম, ব্রত বা জপ তপ ব্যতীত দিনযাপন করে, সেই মহামূর্খ জীবিত থাকলেও তাকে মৃত বলে জানবে।
শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দই, আশ্বিনে দুধ, কার্তিক মাসে মাসকলাই বর্জন করে এই চারমাস শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হয়। প্রতিটি একাদশী ব্রত যথাযথ পালন করতে হয়। শায়িত ভগবান পার্শ্ব পরিবর্তন করেন বলে এই একাদশী মহাপূণ্য ও সকল অভীষ্ট প্রদাতা। এই একাদশী ব্রত পালনে এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

## ইন্দিরা একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন-হে মধুসূদন! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম তা কৃপা করে বলুন।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে রাজন! আশ্বিন মাসের একাদশী 'ইন্দিরা' নামে পরিচিত। এই ব্রত প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। এমনকি কর্মবিপাকে যারা নিম্নযোনি লঅভ করেছেন, সেই পূর্বপুরুষদেরও উত্তম গতি লাভ হয়। এই একাদশীর মহাত্ম্য শোনামাত্রই সামবেদীর যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হে রাজন! মাহিস্মতি নগরে ইন্দ্রসেন নামে একা প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ধর্মবিধি অনুসারে রাজ্য পালনে তিনি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তার বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল। পুত্র-পৌত্রাদিসহ তিনি সুখে রাজ্য পরিচালনা করতেন। বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ সেই রাজা নিরন্তর শ্রীগোবিন্দ নামগানে মগ্ন থাকতেন।
একদিন রাজা সুখে রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গ থেকে সেখানে এলেন। তাঁকে দর্শন করে রাজা হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন।

দন্ডবৎ প্রণাম করে মুনিকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য আদি ষোড়শোপচারে পূজা নিবেদন করলেন। তারপর বললেন- হে মুনিবর! আপনার দর্শনমাত্র আমার যাবতীয় যজ্ঞফল লাভ হয়েছে। এখন আপনার আগমনের কারণ জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন।
দেবর্ষি নারদ বললেন- হে মহারাজ! অতি বিস্ময়কর এক কথা শ্রবণ করুন। আমি একসময় যমলোকে গিয়েছিলাম। সেখানে যমরাজের সভায় বহু পুণ্যকারী আপনার পিতাকে দেখলাম। ব্রতভঙ্গ পাপে তাকে সেখানে যেতে হয়েছে। হে রাজন! আপনার পিতা যে সংবাদ প্রেরণ করেছেন, আমি এখন তা আপনাকে বলছি।

তিনি বললেন- 'হে ঋষিবর! মাহিস্মতির ইন্দ্রসেন রাজা আমার পুত্র। তাকে বলবেন যে, আমি বহু পুণ্য অনুষ্ঠান করলেও কোন কারণবশত যমালয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি কৃপা করে তাকে সর্বপাপনাশক আন্দিরা একাদশী ব্রত পালন করতে বলবেন। সেই ব্রত প্রভাবে আমি নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গলোকে যেতে সমর্থ হব।' এই কথা জানাবার জন্যই আমার আগমন। হে রাজন! আপনার পিতার মঙ্গলবিধানে আপনি যথাবিধি আন্দিরা ব্রত পালন করুন।
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন- হে দেবর্ষি! সেই ইন্দিরা ব্রতের বিধি কি, কোন তিথি বা কোন পক্ষে এই একাদশী ব্রত করা কর্তব্য, তা কৃপা করে আমাকে বলুন।

দেবর্ষি উত্তর দিলেন- হে মহারাজ! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে দশমীর দিন শ্রদ্ধাসহকারে প্রাতঃস্নান করবেন, মধ্যাহ্নে ভক্তিভাবাপন্ন হয়ে পুনরায় স্নান করবেন এবং রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করবেন।
পরদিন একাদশীতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে নিরাহারে থাকবেন। ব্রতের নিয়মাবলী দৃঢ়ভাবে পালন করবেন। 'হে পুন্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! এ শরণাগতের প্রতি কৃপা করুন। এভাবে শ্রদ্ধা সহকারে শালগ্রাম পূজা করে পিতার উদ্দেশ্যে ব্রতের ফল অর্পণ করবেন।দ্বাদশীর দিন সকালে ভক্তিভরে শ্রীগোবিন্দের পূজা করে ব্রহ্মণ ভোজন করিয়ে অবশেষে নিজে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবেন। হে রাজন! বিধি অনুসারে শ্রীহরি এবং ভক্তদের অর্চন করলে আপনার পিতৃবর্গ মুক্তিলাভ করে শীঘ্রই বৈকুণ্ঠে গমন করবেন।রাজাকে এই উপদেশ দিয়ে দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করলেন। রাজা ইন্দ্রসেন মুনিবরের উপদেশ অনুসারে পুত্রপরিজনসহ ভক্তিসহকারে এই ইন্দিরা ব্রতের

অনুষ্ঠান করলেন। তখন দেবলোক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে রাগল এবং তার পিতাও বিষ্ণুলোকে গমন করলেন।
গারপর রাজা ইন্দ্রসেন নিজপুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে নিজেও বিষ্ণলোকে ফিরে গেলেন। এ্রিই ইন্দিরা একাশীর মহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে মানুষ সকল পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে ফিরে গেলেন। এই ইন্দিরা একাদশীর মাহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে মানুষ সকল পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

## পাশাঙ্কুশা একাদশী

আশ্বিন শুক্লপক্ষীয়া পাশাঙ্কুশা একাদশী মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠির বললেন- হে মধুসূদন! আশ্বিন শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি?
তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে রাজেন্দ্র! আশ্বিনের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী 'পাশাঙ্কুশা' নামে প্রসিদ্ধা। কেউ কেউ একে পাপাঙ্কুশাও বলে থাকেন। এই একাদশীতে অভিষ্ট ফল লাভের জন্য মুক্তিদাতা পদ্মনাভের পূজা করবে। শ্রীহরির নাম সংকীর্তন দ্বারা পৃথিবীর সর্ব তীর্থের ফল লাভ হয়।

বদ্ধ জীব মোহবশত বহু পাপকর্ম করেও ভগবান শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়ে প্রণাম নিবেদনে নরকযাতনা থেকে রক্ষা পায়। এই একাদশীর মহিমা শোনার ফলে নিদারুণ যমদন্ড থেকে মুক্তি লাভ হয়। শ্রীহরিবাসর ব্রতের মতো ত্রিভুবনে পবিত্রকারী আর কোন বস্তু নেই।
হাজার হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত শত রাজসূয় যজ্ঞ এই ব্রতের শতভাগের একাংশের সমান হয় না। এই ব্রত পালনে স্বর্গবাস হয়। মুক্তি, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, সুপত্নী, বন্ধু প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করা যায়।

হে রাজন! গয়া, কাশী এমনকি কুরুক্ষেত্রেও শ্রীহরিবাসর অপেক্ষা পুণ্যস্থান নয়। হে ভূপাল! একাদশী উপবাস ব্রত করে রাত্রি জাগরণ করলে অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। এই পাশাঙ্কুশা ব্রতের ফলে মানুষ সর্বপাপ মুক্ত হয়ে গোলোকে গমন করতে সমর্থ হয়।এই পবিত্র দিনে যিনি স্বর্ণ, তিল, গাভী, অন্ন, বস্ত্র, জল, ছত্র, পাদুকা দান করেন, তাঁকে আর যমালয়ে যেতে হয় না। যারা এসকল পুণ্যকার্য করে না, তাদের জীবন কামারশালার হাপরের মতো বিফল।

নিষ্ঠার সাথে এই ব্রত পালনে উচ্চকুলে নিরোগ ও দীর্ঘায়ু শরীর লাভ হয়। অত্যন্ত পাপাচারীও যদি এই পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করে তবে সেও রৌরব নামক মহাযন্ত্রনা থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠসুখ লাভ করে। কৃষ্ণভক্তি লাভই শ্রীএকাদশী ব্রতের মুখ্য ফল। তবে আনুষাঙ্গিকরূপে স্বর্গ, ঐশ্বর্যাদি অনিত্য ফল লাভ হয়ে থাকে।

## রমা একাদশী

একসময় যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন-হে জনার্দন। কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্য কৃপা করে আমায় বলুন।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন-হে রাজন। মহাপাপ দুরকারী সেই একাদশী 'রমা' নামে বিখ্যাত। আমি এখন এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই, আপনি তা মনোযোগ সহকারে শবণ করুন।

পুরাকালে মচুকুন্দ নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ ও ধনপতি কুবেরের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। ভক্তশ্রেষ্ঠ বিভীষণের সাথেও তার অত্যন্ত সম্ভাব ছিল। তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। এইরূপে তিনি ধর্ম অনুসারে রাজ্যশাসন করতেন।

চন্দ্রভাগা নামে তার একটি কন্যা ছিল। চন্দসেনের পুত্র শোভনের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। শোভন একসময় শ্বশুর বাড়িতে এসেছিল। দৈবক্রমে সেইদিন ছিল একাদশী তিথি।স্বামীকে দেখে পতিপরায়ণা চন্দ্রভাগা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল।- হে ভগবান! আমার স্বামী অত্যন্ত দুর্বল, তিনি ক্ষুধা সহ্য করতে পারেন না।

এখানে আমার পিতার শাসন খুবই কঠোর। দশমীর দিন তিনি নাগরা বাজিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, একাদশী দিনে আহার নিষিদ্ধ। আমি এখন কি করি!
রাজার নিষেধাজ্ঞা শুনে শোভন তার প্রিয়তমা পত্নীকে বলল- হে প্রিয়ে, এখন আমার কি কর্তব্য, তা আমাকে বলো। উত্তরে রাজকন্যা বলল- হে স্বামী, আজ এই গৃহে এমনকি রাজ্যমধ্যে কেউই আহার করবে না।
মানুষের কথা তো দূরে থাকুক পশুরা পর্যন্ত অন্নজল মাত্র গ্রহণ করবে না। হে নাথ, যদি তুমি এ থেকে পরিত্রাণ চাও তবে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন কর। এখানে আহার করলে তুমি সকলের নিন্দাভাজন হবে এবং আমার পিতাও ক্রুদ্ধ হবেন।

এখন বিশেষভাবে বিচার করে যা ভাল হয়, তুমি তাই কর। সাধ্বী স্ত্রীর এই কথা শুনে শোভন বলল- হে প্রিয়ে! তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি গৃহে যাব না । এখানে থেকে একাদশী ব্রত পালন করব। ভাগ্যে যা লেখা আছে তা অবশ্যই ঘটবে।
এইভাবে শোভন ব্রত পালনে বদ্ধপরিকর হলেন। সমস্ত দিন অতিক্রান্ত হয়ে রাত্রি শুরু হল। বৈষ্ণবদের কাছে সেই রাত্রি সত্যিই আনন্দকর। কিন্তু শোভনের পক্ষে তা ছিল বড়ই দুঃখদায়ক।কেননা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল। এভাবে রাত্রি অতিবাহিত হলে সূর্যোদয়কালে তার মৃত্যু হল। রাজা মুচুকুন্দ সাড়ম্বরে তার শবদাহকার্য সুসম্পন্ন করলেন। চন্দ্রভাগা স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করে পিতার আদেশে পিতৃগৃহেই বাস করতে লাগল।

কালক্রমে রামব্রত প্রভাবে শোভন মন্দরাচল শিখরে অনুপম সৌন্দর্যবিশিষ্ট এক রমণীয় দেবপুরী প্রাপ্ত হলেন। একসময় মচুকুন্দপুরের সোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণ করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে রত্নমন্ডিত বিচিত্র স্ফটিকখচিত সিংহাসনে রত্নালঙ্কারে ভূষিত রাজা শোভনকে তিনি দেখতে পেলেন। গন্ধর্ব ও অস্পরাগণ দ্বারা নানা উপচারে সেখানে তিনি পূজিত হচ্ছিলেন। রাজা মুচুকুন্দের জামাতারুপে ব্রাহ্মণ তাকে চিনতে পেরে তার কাছে গেলেন। শোভনও সেই ব্রাহ্মণকে দেখে আসন থেকে উঠে এসে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। শ্বশুর মচুকুন্দ ও স্ত্রী চন্দ্রভাগা সহ নগরবাসী সকলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রহ্মণ সকলের কুশল সংবাদ জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন-এমন বিচিত্র মনোরম স্থান কেউ কখনও দেখেনি। আপনি কিভাবে এই স্থান প্রাপ্ত হলেন, তা সবিস্তারে আমার কাছে বর্ণনা করুন।
শোভন বললেন যে, কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া রমা একাদশী সর্বব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি তা শ্রদ্ধারহিতভাবে পালন করলেও তার আশ্চর্যজনক এই ফল লাভ করেছি। আপনি কৃপা করে চন্দ্রভাগাকে সমস্ত ঘটনা জানাবেন।

সোমশর্ম্মা মচুকুন্দপুরে ফিরে এসে চন্দ্রাভাগার কাছে সমস্ত ঘটনার কথা জানালেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত চন্দ্রভাগা বললেন- হে ব্রাহ্মণ! আপনার কথা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।তখন সোমশর্ম্মা বললেন- হে ব্রাহ্মণ! আপনার কথা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তখন সোমশর্ম্মা বললেন- হে পুত্রী, সেখানে তোমার স্বামীকে আমি স্বয়ং সচক্ষে দেখেছি। অগ্নিদেবের মতো দীপ্তিমান তার নগরও দর্শন করেছি।কিন্তু তার নগর স্থির নয়, তা যাতে স্থির হয় সেই মতো কোন উপায় কর। এসব কথা শুনে চন্দ্রভাগা বললেন, তাকে দেখতে আমার একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে। আমাকে এখনই তার কাছে নিয়ে চলুন। আমি ব্রত পালনের পুণ্যপ্রভাবে এই নগরকে স্থির করে দেব।তখন সোমশর্ম্মা চন্দ্রভাগাকে নিয়ে মন্দার পর্বতে বামদেবের আশ্রমে উপনীত হলেন। সেখানে ঋষির কৃপায় ও হরিবাসর ব্রত পালনের ফলে চন্দ্রভাগাকে নিয়ে মন্দার ও হরিবাসর ব্রত পালনের ফলে চন্দ্রভাগা দিব্য শরীর ধারণ করল। দিব্য গতি লাভ করে নিজ স্বামীর নিকট উপস্থিত হলেন। প্রিয় পত্নীকে দেখে শোভন অতীব আনন্দিত হলেন।বহুদিন পর স্বামীর সঙ্গ লাভ করে চন্দ্রভাগা অকপটে নিজের পুণ্যকথা জানালেন। হে প্রিয়, আজ থেকে আট বছর আগে আমি যখন পিতৃগৃহে ছিলাম তখন থেকেই এই রমা একাদশীর ব্রত নিষ্ঠাসহকারে পালন করতাম। ঐ পুণ্য প্রভাবে এই নগর স্থির হবে এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাকবে।
হে মহারাজ! মন্দারাচল পর্বতের শিখরে শোভন স্ত্রী চন্দ্রভাগা সহ দিব্যসুখ ভোগ করতে লাগলেন। পাপনাশিনী ও ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনী রমা একাদশীর মাহাত্মা আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। যিনি এই একাদশী ব্রত শ্রবণ করবেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে পূজিত হবেন।

# উত্থান একাদশী

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদ সংবাদে বর্ণিত আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন- হে পুরুষোত্তম! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম আমার কাছে কৃপা করে বর্ণনা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে পুরুষোত্তম! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম আমার কাছে কৃপা করে বর্ণনা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে রাজন! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী 'উত্থান' বা 'প্রবোধিনী' নামে খ্যাত। প্রজাপতি ব্রহ্মা পূর্বে নারদের কাছে এই একাদশীল মহিমা কীর্তন করেছিলেন। এখন তুমি আমার কাছে সেকথা শ্রবণ কর।

দেবর্ষি নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বললেন- হে মহাত্মা! যে একাদশীতে ভগবান শ্রীগোবিন্দ শয়ন থেকে জেগে ওঠেন, সেই প্রবোধিনী বা উত্থান একাদশীর মহিমা আমার কাছে সবিস্তারে কীর্তন করুন।

ব্রহ্মা বললেন-হে নারদ! উত্থান একাদশী যথার্থই পাপনাশিনী, পুণ্যবর্ধিনী ও মুক্তিপ্রদায়ী। এই একাদশী ব্রত নিষ্ঠার সাথে পালন করলে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল অনায়াসে লাভ হয়।

জগতের দুর্লভ বস্তুর প্রাপ্তির কথা আর কি বলব! এই একাদশী ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্য, প্রজ্ঞা, রাজ্য ও সুখ প্রদান করে। এই ব্রতের প্রভাবে পর্বত প্রমাণ পাপরাশি বিনষ্ট হয়ে যায়।

যরা একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করেন, তাদের সমস্ত পাপ ভস্মীভুত হয়। শ্রেষ্ঠ মুনিগণ তপস্যার দ্বারা যে ফল করেন, এই ব্রতের উপবাসে তা পাওয়া যায়। যথাযথভাবে এই ব্রত পালন করলে আশাতীত ফল লাভ হয়। কিন্তু অবিধিতে উপবাস করলে স্বল্পমাত্র ফল প্রাপ্তি হয়।

যারা এই একাদশীর ধ্যান করেন, তাদের পূর্বপুরুষেরা স্বর্গে আনন্দে বাস করেন। এই একাদশী উপবাস ফলে ব্রহ্মহত্যা জনিত ভয়ঙ্কর নরকযন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে বৈকুন্ঠগতি লাভ হয়।

অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাও যা সহজে লাভ হয় না, তীর্থে স্বর্ণ প্রভৃতি দান করলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, এই উপবাসের রাত্রি জাগরণে সেই সকল অনায়াসে লাভ হয়ে যায়।

যিনি সঠিকভাবে উত্থান একাদশীর ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তার গৃহে ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ এসে উপস্থিত হয়। হে নারদ! বিষ্ণুর প্রিয়তমা এই প্রবোধিনী একাদশীর উপবাস করলে সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান ও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে চরমে মুক্তি লাভ হয়।

যিনি সমস্ত লৌকিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ভক্তিভরে এই ব্রত উপবাস করেন, তাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। এমনকি মন ও বাক্য দ্বারা অর্জিত পাপরাশিও শ্রীগোবিন্দের অর্চনে বিনষ্ট হয়ে যায়।

হে বৎস! এই ব্রতে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীজনার্দনের উদ্দেশ্যে স্নান, দান, জপ, কীর্তন ও হোমাদি করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। যারা উপবাস দিনে শ্রীহরির প্রতি ভক্তিভাবে দিনযাপন করেন, তাদের পক্ষে জগতে দুর্লভ বলে আর কিছু নেই।

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে স্নান করলে যে পুণ্য হয় এই উপবাসে রাত্রি জাগরণে তার সহস্রগুণ সুকৃতি লাভ হয়। তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম ধ্যান আদির ফলে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, উত্থান একাদশী না করলে সে সমস্ত নিষ্ফলে হয়ে যায়। হে নারদ! শ্রীহরিবাসরে শ্রীজনার্দনের পূজা বিশেষ ভক্তিসহকারে করবে। তা না হলে শতজন্মার্জিত পুণ্যও বিফল হয়।

হে বৎস! যিনি কার্তিক মাসে সর্বদা ভাগবত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে সমস্ত যজ্ঞের ফল লঅভ করেন। ভগবান হরিভক্তিমূলক শাস্ত্রপাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।কিন্তু দান, জপ, যজ্ঞাদি দ্বারা তেমন প্রীত হন না। এই মাসে শ্রীবিষ্ণুর নাম, গুণ, রূপ, লীলাদি শ্রবণ-কীর্তন অথবা শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রগ্রন্থ্ পাঠের ফলে শত শত গোদানের ফল অচিরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব হে মুনিবর। কার্তিক মাসে সমস্ত গৌণধর্ম বর্জন করে শ্রীকেশবের সামনে হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করা কর্তব্য। কোন ব্যক্তি যদি ভক্তিসহকারে এই মাসে ভক্তসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তবে তাঁর শতকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হন এবং হাজার হাজার দুগ্ধবতী গাভী দানের ফল অনায়াসে লাভ করেন।এই মাসে পবিত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণাদির শ্রবণ-কীর্তনে দিনযাপন করলে তার আর পুণর্জন্ম হবে না। এই মাসে বহু ফলমুল, ফুল, অগুরু, কর্পূর ও চন্দন দিয়ে শ্রীহরির পূজা করা কর্তব্য।

সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করলে যে পূণ্য সঞ্চয় হয়, উত্থান একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদানে তার কোটিগুণ সুকৃতি অর্জিত হয়। শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণ, বন্দনাদি নববিধা ভক্তির সাথে তুলসীর সেবার জন্য যারা বীজ রোপন, জলসেচন ইত্যাদি করেন, তারা মুক্তিলাভ করে বৈকুন্ঠবাসী হন।

হে নারদ! সহস্র সুগন্ধী পুষ্পে দেবতার অর্চনে বা সহস্র সহস্র যজ্ঞ ও দানে যে ফল লাভ হয়, এই মাসের শ্রীহরিবাসরে একটি মাত্র তুলসী পাতা শ্রীভগবানের চরণকমলে অর্পণ করলে তার অনন্তকোটিগুণ ফল লাভ হয়।

## উৎপন্না একাদশী

অর্জুন বললেন-হে দেব! অগ্রহায়ণের পুণ্যপ্রদায়ী কৃষ্ণপক্ষের একাদশীকে কেন 'উৎপন্না' বলা হয় এবং কি জন্যই বা এই একাদশী পরম পবিত্র ও দেবতাদেরও প্রিয়, তা জানতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করে আমাকে তা বলুন।

শ্রীভগবান বললেন- হে পৃথাপুত্র! পূর্বে সত্যযুগে 'মুর' নামে এক দানব ছিল। অদ্‌ভুত আকৃতিবিশিষ্ট সেই দানবের স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোপন। সে দেবতাদেরও ভীতিপ্রদ ছিল।যুদ্ধে দেবতাদের এমনকি স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে পর্যন্ত পরাজিত করে স্বর্গ থেকে বিতারিত করেছিল। এইভাবে দেবতারা পৃথিবীতে বিচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

তখন দেবতারা মহাদেবের কাছে গিয়ে নিজেদের সমস্ত দুঃখ সবিস্তারে জানালেন। শুনে মহাদেব বললেন- হে দেবরাজ! যেখানে শরণাগতবৎসল জগন্নাথ, গরুধ্বজ বিরাজ করছেন, তোমরা সেখানে যাও। তিনি আশ্রিতদের পরিত্রাণকারী। তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের মঙ্গল বিধান করবেন।

দেবাদিদেবের কথামতো দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করলেন। জলে শায়িত শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করে দেবতারা হাতজোড় করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। স্তুতির মাধ্যমে নিজ নিজ দৈন্য ও দুঃখের কথা তাঁরা ভগবানকে জানালেন।ইন্দ্রের কথা শুনে ভগবান নারায়ণ বললেন- হে ইন্দ্র! সেই মুর দানব কি রকম, সে কেমন শক্তিশালী, তা আমায় বল। ইন্দ্র বললেন-হে ভগবান! প্রাচীনকালে ব্রহ্ম বংশে তালজঙঘা নামে এক অতি পরাক্রমী অসুর ছিল।

তারই পুত্র সেই 'মুর' অত্যন্ত বলশালী, ভীষণ উৎকট ও দেবতাদেরও ভয় উৎপাদনকারী। সে চন্দ্রাবতী নামে এক পুরীতে বাস করে।

স্বর্গ থেকে আমাদের বিতাড়িত করে তার স্বজাতি কাউকে রাজা, কাউকে অন্যান্য দিকপালরূপ প্রতিষ্ঠিত করে এখন সে দেবলোক সম্পূর্ণ অধিকার করেছে। তার প্রবল প্রতাপে আজ আমরা পৃথিবীতে বিচরণ করছি।ইন্দ্রের কথা শুনে ভগবান দেবদ্রোহীদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে চন্দ্রাবতী পুরীতে গেলেন। সেই দৈত্যরাজ শ্রীনারায়ণকে দর্শন করে পুনঃ পুনঃ গর্জন করতে লাগল।

দেবতা ও অসুরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীনারয়ণকে একা দেখে সেই দানব

তাঁকে ‘দাঁড়াও দাঁড়াও’ বলতে লাগল। শ্রীভগবানও ক্রোধে গর্জন করে বললেন- রে দুরাচার দানব আমার বাহুবল দেখ।

এই বলে অসুরপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধাদের দিব্য বাণের আঘাতে নিহত করতে লাগলেন। তখন তারা প্রাণভয়ে নানা দিকে পালাতে লাগল।সেই সময় নারায়ণ দৈত্য সৈন্যদের মধ্যে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলেন। ফলে সমস্ত সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। একমাত্র মুর অসুরই জীবিত ছিল। সে অস্ত্রযুদ্ধে নারায়ণকেও পরাজিত করল। তখন নারায়ণ দৈত্যের সাথে বাহুযুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

এইভাবে দেবতাদের হিসাবে এক হাজার বছর যুদ্ধ করেও ভগবান তাকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন শ্রীহরি বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে বদরিকা আশ্রমে গমন করলেন। সেখাতে সিংহাবতী নামে একটি গুহা আছে।এই গুহাটি এক-দ্বার বিশিষ্ট এবং বারোযোজন অর্থাৎ ৮৬ মাইল বিস্তৃত। ভগবান বিষ্ণু সেই গুহার মধ্যে শয়ন করলেন। সেই দৈত্যও তার পিছন পিছন ধাবিত হয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করল।

সে বিষ্ণুকে নিদ্রিত বুঝতে পারল। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে গোপনে শুয়ে আছে। এখন আমি তাকে অবশ্যই বধ করব। দানবের এইরকম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর শরীর থেকে একটি কন্যা উৎপন্ন হল।এই কন্যাই ‘উৎপন্না’ একাদশী। তিনি রূপবতী, সৌভাগ্যশালিনী, দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রধারিনী ও বিষ্ণু তেজসম্ভুতা বলে মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। দৈত্যরাজ সেই স্ত্রীরূপিনী দেবীর সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু করল।

কিছুকাল যুদ্ধের পর দেবীর দিব্য তেজে অসুর ভস্মীভূত হয়ে গেল। তারপর বিষ্ণু জেগে উঠে সেই ভস্মীভূত দানবকে দেখে বিস্মিত হলেন। এক দিব্যকন্যাকে তাঁর পাশে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

বিষ্ণু বললেন- হে মহাপরাক্রান্ত উগ্রমূর্তি! এই মুর দানবকে কে বধ করল? যিনি একে হত্যা করেছে তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কর্ম করেছে।

সেই কন্যা বললেন- হে প্রভু! আমি আপনার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন এই দানব আপনাকে বধ করতে চেয়েছিল। তা দেখে আমি তাকে বধ করেছি। আপনাদের কৃপাতেই আমি তাকে বধ করতে পেরেছি।

একথা শুনে ভগবান বললেন- আমার পরাশীক্ত তুমি একাদশীতে উৎপন্ন হয়েছ। তাই তোমার নাম হবে একাদশী। আমি এই ত্রিলোকে দেবতা ও ঋষিদের অনেক বর প্রদান করেছি। হে ভদ্রে! তুমিও তোমার মনমতো বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তা প্রদান করব।

একাদশী বললেন- হে দেবেশ! ত্রিভুবনের সর্বত্র আপনার কৃপায় সর্ববিঘ্ননাশিনী ও সর্বদায়িনী রূপে যেন পরম পূজ্য হতে পারি, এ বিধান করুন। আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ যারা শ্রদ্ধাসহকারে আমার ব্রত-উপবাস করবে, তাদের সর্বসিদ্ধি লাভ হবে-এই বর প্রদান করুন।বিষ্ণু বললেন-হে কল্যাণী! তাই হোক। 'উৎপন্না' নামে প্রসিদ্ধ তোমার ব্রত পালনকারীর সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি তাদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।তোমাকে আমার শক্তি বলে মনে করি। তাই তোমার ব্রত পালকারী সকলে আমারই পূজা করবে। এর ফলে তারা মুক্তি লাভ করবে। তুমি হরিপ্রিয়া নামে জগতে বিখ্যাত হবে।

তুমি ব্রতপালনকারীর শত্রুবিনাশ, পরমগতি দান এবং সর্বসিদ্ধি প্রদান করতে সমর্থ হবে। ভগবান বিষ্ণু এইভাবে 'উৎপন্না' একাদশীকে বরদান করে অন্তর্হিত হলেন।

সমস্ত ব্রতকারী দিবারাত্রি ভক্তিপরায়ণ হয়ে এই উৎপন্না একাশীর উৎপত্তির কথা শ্রবণ-কীর্তন করলে শ্রীহরির আশীর্বাদ লাভে ধন্য হবে।

## মোক্ষদা একাদশী

যুধিষ্ঠির বললেন-হে বিষ্ণো! আপনাকে আমি বন্দনা করি। আপনি ত্রিলোকের সুখদায়ক, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপালক ও পুরুষোত্তম। আমার একটি সংশয় আছে। অগ্রাহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের যে একাদশী তার নাম কি, বিধিই বা কি ও কোন দেবতা এই একাদশীতে পূজিত হন, তা আমায় বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন-হে মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, যার মাধ্যমে আপনার যশ চতুর্দিকে বিস্তৃত হবে। এখন এই একাদশীর কথা আমি বর্ণনা করছি যা শোনা মাত্রই বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।অগ্রাহয়ণ মাসের শুক্লপক্ষের এই একাদশী 'মোক্ষদা' নামে পরিচিত। সর্বপাপনাশিনী ও ব্রত মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা এই একাদশীর দেবতা শ্রীদামোদর। তুলসী, তুলসী মঞ্জুরী, ধূপ, দীপ, ইত্যাদি উপচারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীদামোদরের পূজা করতে হবে। পূর্ববর্ণিত বিধি অনুসারে দশমী ও একাদশী পালন করতে হবে। এই উপবাস দিনে স্তবস্তুতি, নৃত্য-গীত আদি সহ রাত্রিজাগরণ করা কর্তব্য।
হে মহারাজ! প্রসঙ্গক্রমে একটি অলৌকিক কাহিনী আমি বলছি। মনোযোগ দিয়ে এই ইতিহাস শ্রবণ মাত্রই সর্বপাপ ক্ষয় হয়। যে পিতৃপুরুষেরা নিজ নিজ পাপে অধঃযোনি প্রাপ্ত হয়েছে, এই ব্রত পালনের পুণ্যফল বিন্দু মাত্র তাদেরকে দান করলে তারাও মুক্তিলাভের যোগ্য হন।কোন এক সময় মনোরম চম্পক নগরে বৈখানস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সমস্ত সদগুণে বিভূষিত। প্রজাদের তিনি পুত্রের মতো পালন করতেন। 3

তাঁর রাজ্যে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। রাজ্যের সকলেই ছিল বেশ সমৃদ্ধশালী। একবার রাজা স্বপ্নে দেখলেন যে তার পিতা নরকে পতিত হয়েছেন। তা দেখে তিনি অত্যন্ত হলেন।পরদিন ব্রাহ্মণদের ডেকে বলতে লাগলেন- হে ব্রাহ্মণগণ। গতরাত্রিতে স্বপ্নে নরকযাতনায় পিতাকে কষ্ট পেতে দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন- হে পুত্র, তুমি আমাকে নরকসমুদ্র থেকে উদ্ধার কর। তাঁর সেই অবস্থা দেখে আমার অন্তরে সুখ নেই।

আমার এই বিশাল রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র, কিছুতেই আমি শান্তি পাচ্ছি না। কি করি, কোথায় যাই কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার পুর্বপুরুষেরা মুক্তিলাভ করতে পারেন এমন কোন পুণ্যব্রত, তপস্যা ও যোগের কথা আমাকে উপদেশ করুন। আমি তা অনুষ্ঠান করব।আমার মতো পুত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি পিতামাতা পূর্বপুরুষেরা যদি নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন, তবে সে পুত্রের কি প্রয়োজন?

ব্রাহ্মণগণ বললেন- হে মহারাজ! আপনার রাজ্যের কাছেই মহর্ষি পর্বত মুনির আশ্রম রয়েছে। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তাঁর কাছে আপনার মুক্তির উপায় জানতে পারবেন। ব্রহ্মণদের উপদেশ শ্রবণ করে মহাত্মা বৈখানস তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সেই পর্বত মুনির আশ্রমে গমন করলেন। তাঁরা দূর থেকে ঋষিবরকে সষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তার কাছে গেলেন। মুনিবর রাজার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন।রাজা বললেন- হে প্রভু! আপনার কৃপায় আমার সবই কুশল। তবে আমি একদিন স্বপ্নযোগে পিতার নরকযন্ত্রণা ও কাতর আর্তনাদ্ শুনে অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি।

হে ঋষিবর! কোন পুণ্যের ফলে তিনি সেই দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবেন, তার উপায় জানতেই আপনার শরণাগত হয়েছি।রাজার কথা শুনে পর্বত মুনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বললেন- হে মহারাজ! পূর্বজন্মে তোমার পিতা অত্যন্ত কামাচারী হওয়ায় তার এরকম অধোগতি লাভ হয়েছে।এখন এই পাপ থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা করছি। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের মোক্ষদা একাদশী পালন করে সেই পুণ্যফল পিতাকে প্রদান কর। সেই পুণ্য প্রভাবে তোমার পিতার মুক্তি লাভ হবে।

মুনির কথা শোনার পর রাজা নিজগৃহে ফিরে এলেন। সেই পবিত্র তিথির আবির্ভাবে তিনি স্ত্রী-পুত্রাদিসহ যথাবিধি মোক্ষদা একাদশী ব্রত পালন করলেন। ব্রতের পুণ্যফল পিতার উদ্দেশ্যে প্রদান করলেন।ঐ পুণ্যফল দানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। 'হে পুত্র তোমার মঙ্গল হোক।' এই বলতে বলতে বৈখানস রাজার পিতা নরক থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করলেন।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই মঙ্গলদায়িনী মোক্ষদা একাদশী ব্রত পালন করে, তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করে। এই ব্রতের পুণ্যসংখ্যা

আমিও জানি না।চিন্তামণির মতো এই ব্রতটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই ব্রত কথা যিনি পাঠ করেন এবং যিনি শ্রবণ করেন, উভয়েই বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। সফলা একাদশীপৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম 'সফলা'। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে এই তিথির মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির বললেন- হে প্রভু! পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম, বিধি এবং পূজ্যদেবতা বিষয়ে আমার কৌতুহল নিবারণ করুন।শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মহারাজ! আপনার প্রতি স্নেহবশত সেই ব্রত কথা বিষয়ে বলছি। এই ব্রত আমাকে যেরকম সন্তুষ্ট করে, বহু দানদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদি দ্বারা আমি সেইরকম সন্তুষ্ট হই না। তাই যত্নসহকারে এই ব্রত পালন করা কর্তব্য।
পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম 'সফলা' । নাগদের মধ্যে যেমন শেষনাগ, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, দেবতাদের মধ্যে নারায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ; তেমনই সকল ব্রতের মধ্যে একাদশী ব্রতই সর্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! যারা এই ব্রত পালন করেন, তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাদের এজগতে ধনলাভ ও পরজগতে মুক্তি লাভ হয়। হাজার বছর তপস্যায় যে ফল লাভ হয় না, একমাত্র সফলা একাদশীতে রাত্রি জাগরণের ফলে তা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।মহিষ্মত নামে এক রাজা প্রসিদ্ধ চম্পাবতী নগরে বাস করতেন। রাজার চারজন পুত্র ছিল। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র লুম্ভক সর্বদা পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান প্রভৃতি অসৎ কার্যে রত ছিল। সে সর্বক্ষণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেবতাদের নিন্দা করত।পুত্রের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা তাকে রাজ্য থেকে বার করে দিলেন। স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে সে এক গভীর বনে প্রবেশ করল। সেখানে কখনও জীবহত্যা আবার কখনও চুরি করে জীবন ধারণ করতে লাগল। কিছুদিন পরে একদিন সে নগরে প্রহরীদের কাছে ধরা পড়ল।কিন্তু রাজপুত্র বলে সেই অপরাধ থেকে সে মুক্তি পেল। পুনরায় সে বনে ফিরে গিয়ে জীবহত্যা ও ফলমূল আহার করে দিন যাপন করতে লাগল।ঐ বনে বহু বছরের পুরানো একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সেখানে ভগবান শ্রীবাসুদেব বিরাজমান বলে বৃক্ষটি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সেই বৃক্ষতলে পাপবুদ্ধি লুম্ভক বাস করত।বহুদিন পর তার পূর্বজন্মের কোন পুণ্য ফলে সে পৌষ মাসের দশমী দিনে কেবল ফল আহারে দিন অতিবাহিত করল। কিন্তু রাত্রিতে অসহ্য শীতের প্রকোপে সে মৃতপ্রায় হয়ে রাত্রিযাপন করল। পরদিন সূর্যোদয় হলেও সে অচেতন হয়েই পড়ে রইল। দুপুরের দিকে তার চেতনা ফিরল। ক্ষুধা নিবারণের জন্য সে অতিকষ্টে কিছু ফল সংগ্রহ করল।

এরপর সেই বৃক্ষতলে এসে পুনরায় বিশ্রাম করতে থাকল। রাত্রিতে খাদ্যাভাবে সে দুর্বল হয়ে পড়ল। সে প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফলগুলি নিয়ে-'হে ভগবান! আমার কি গতি হবে' বলে অশ্রুপাত করতে করতে সেই বৃক্ষমূলে, 'হে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ! আপনি প্রসন্ন হোন' বলে নিবেদন করল। এইভাবে সে অনাহারে ও

অনিদ্রায় সেই রাত্রি যাপন করল।ভগবান নারায়ণ সেই পাপী সুম্ভকের রাত্রি জাগরণকে একাদশীর জাগরণ এবং ফল অর্পণকে পূজা বলে গ্রহণ করলেন। এইভাবে অজ্ঞাতসারে লুম্ভকের সফলা একাদশী ব্রত পালন হয়ে গেল।
প্রাতঃ কালে আকাশে দৈববাণী হল-হে পুত্র, তুমি সফলা ব্রতের পুণ্য প্রভাবে রাজ্য প্রাপ্ত হবে। সেই দৈববাণী শোনামাত্র লুম্ভক দিব্যরূপ লাভ করল। তার পাপবুদ্ধি দূর হল।সে পুনরায় নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করল। স্ত্রীপুত্রসহ কিছুকাল রাজ্যসুখ ভোগের পর পুত্রের ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করল। অবশেষে মৃত্যুকালে সে অশোক অভয় ভগবানের কাছে ফিরে গেল।
হে মহারাজ! এভাবে সফলা একাদশী যিনি পালন করেন, তিনি জাগতিক সুখ ও পরে মুক্তি লাভ করেন।এই ব্রতে যারা শ্রদ্ধাশীল, তাঁরাই ধন্য।তাঁদের জন্ম সার্থক, এতে কোন সন্দেহ নেই। এই ব্রত মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণে মানুষের রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

## পুত্রদা একাদশী

যুধিষ্ঠির বললেন- হে কৃষ্ণ! পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি, বিধিই বা কি, কোন দেবতা ঐ দিনে পূজিত হন এবং আপনি কার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সেই ব্রতফল প্রদান করেছিলেন কৃপা করে আমাকে সবিস্তারে তা বলুন।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মাহারাজ! এই একাদশী ‘পুত্রদা’ নামে প্রসিদ্ধ। সর্বপাপবিনাশিনী এই একাদশীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হলেন সিদ্ধিদাতা নারায়ণ। ত্রিলোকে এর মতো শ্রেষ্ঠ ব্রত নেই। এই ব্রতকারীকে নারায়ণ বিদ্বান ও যশস্বী করে তোলেন। এখন আমার কাছে ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।ভদ্রাবতী পুরীতে সুকেতুমান নামে এক রাজা ছিলেন। তার রানীর নাম ছিল শৈব্যা। রাজদম্পতি বেশ সুখেই দিনযাপন করছিলেন।বংশরক্ষার জন্য বহুদিন ধরে ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করেও যখন পুত্রলাভ হল না, তখন রাজা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন। তাই সকল ঐশ্বর্যবান হয়েও পুত্রহীন রাজার মনে কোন সুখ ছিল না।তিনি ভাবতেন পুত্রহীনের জন্ম বৃথা ও গৃহশূণ্য। পিতৃ-দেব-মনুষ্যলোকের কাছে যে ঋণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তা পুত্র বিনা পরিশোধ হয় না। পুত্রবানজনের এ জগতে যশলাভ ও উত্তম গতি লাভ হয় এবং তাদের আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। নানা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাজা আত্মহত্যা করবেন বলে স্থির করলেন।কিন্তু পরে বিচার করে দেখলেন- ‘আত্মহত্যা মহাপাপ, এরফলে কেবল দেহের বিনাশমাত্র হবে, কিন্তু আমার পুত্রহীনতা তো দূর হবে না।তারপর একদিন রাজা নিবিড় বনে গমন করলেন। বন ভ্রমণ করতে করতে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে রাজা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হলেন। এদিক ওদিক জলাদির অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

তিনি চক্রবাক,  রাজহংস এবং নানারকম মাছে পরিপূর্ণ একটি মনোরম সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবরের কাছে মুনিদের একটি আশ্রম

ছিল।তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। সরোবর তীরে মুনিগণ বেদপাঠ করছিলেন। মুনিবৃন্দের শ্রীচরণে তিনি দন্ডবৎ প্রণাম করলেন।

মুনিগণ রাজাকে বললেন-হে মহারাজ! আমরা 'বিশ্বদেব' নামে প্রসিদ্ধ। এই সরোবরে স্নান করতে এসেছি। আজ থেকে পাচদিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হবে। আজ পুত্রদা একাদশী তিথি। পুত্র দান করে বলেই এই একাদশীর নাম 'পুত্রদা'।

তাঁদের কথা শুনে রাজা বললেন-হে মুনিবৃন্দ! আমি অপুত্রক। তাই পুত্র কামনায় অধীর হয়ে পড়েছি। এখন আপনাদের দেখে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়ে। এ দুর্ভাগা পুত্রহীনের প্রতি অনুগ্রহ করে একটি পুত্র প্রদান করুন।মুনিগণ বললেন- হে মহারাজ! আজ সেই পুত্রদা একাদশী তিথি। তাই এখনই আপনি এই ব্রত পাল করুন। ভগবান শ্রীকেশবের অনুগ্রহে অবশ্যই আপনার পুত্র লাভ হবে।মুনিদের কথা শোনার পর যথাবিধানে রাজা কেবল ফলমূলাদি আহার করে সেই ব্রত অনুষ্ঠান করলেন। দ্বাদশী দিনে উপযুক্ত সময়ে শস্যাদি সহযোগে পারণ করলেন। মুনিদের প্রণাম নিবেদন করে নিজগৃহে ফিরে এলেন। প্রতভাবে রাজার যথাসময়ে একটি তেজস্বী পুত্র লাভ হল।হে মাহারাজ! এ ব্রত সকলেরই পালন করা কর্তব্য। মানব কল্যাণ কামনায় আপনার কাছে আমি এই ব্রত কথা বর্ণনা করলাম।নিষ্ঠাসহকারে যারা এই পুত্রদা একাদশী ব্রত পালন করবে, তারা 'পুত' নামক নরক থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। আর এই ব্রত কথা শ্রবণ কীর্তনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মান্ডপুরাণে এই মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

## **ষটতিলা একাদশী**

মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের 'ষটতিলা' একাদশীর মাহাত্ম্য ভবিষ্যোত্তরপুরাণে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন- হে জগন্নাথ! মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথির নাম কি, বিধিই বা কি এবং তার কি ফল, সবিস্তারে বর্ণনা করুন।তদুত্তরে ভগবান বললেন- হে রাজন! এই একাদশী 'ষটতিলা' নামে জগতে বিদিত। একসময় দালভ্য ঋষি মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্তকে জিজ্ঞাসা করেন- মর্ত্যলোকে মানুষেরা ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, অন্যের সম্পদ হরণ আদি পাপকর্ম দ্বারা নরকে গমন করে।

যাতে তারা নরক গতি থেকে রক্ষা পায়, তা যথাযথভাবে আমাকে উপদেশ করুন। অনায়াসে সাধন করা যায় এমন কোন কাজের মাধ্যমে যদি তাদের এই পাপ থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকে, তবে তা বলুন।ঋষি পুলস্ত্য বললেন, হে মহাভাগ! তুমি একটি গোপনীয় উত্তম বিষয়ের প্রশ্ন করেছ। মাঘ মাসে শুচি, জিতেন্দ্রিয়, কাম, ক্রোধ আদি শূন্য হয়ে স্নানের পর সর্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করবে।

পূজাতে কোন বিঘ্ন ঘটলে কৃষ্ণনাম স্মরণ করবে। রাত্রিতে অর্চনান্তে হোম করবে। তারপর চন্দন, অগুরু, কর্পুর ও শর্করা প্রভৃতি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করে ভগবানকে নিবেদন করবে।কুষ্মান্ড, নারকেল অথবা একশত গুবাক দিয়ে অর্ঘ্য প্রদান করবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্তমগতীনাং গতির্ভব' ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে হয়।

'কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হোন' বলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কলস, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা, গাভী ও তিলপাত্র দান করবে। স্নান, দানাদি কার্যে কালো তিল অত্যন্ত শুভ। হে দ্বিজত্তম! ঐ প্রদত্ত তিল থেকে পুনরায় যে তিল উৎপন্ন হয়, ততো বছর দানকারী স্বর্গলোকে বাস করে। তিলদ্বারা স্নান, তিল শরীরে ধারণ, তিল জলে মিশিয়ে তা দিয়ে তর্পণ, তিল ভোজন এবং তিল দান- এই ছয় প্রকার বিধানে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়ে থাকে। এই জন্য এই একাদশীর নাম ষটতিলা।হে যুধিষ্ঠির! একসময় নারদও এই ষটতিলা একাদশীর ফল ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাইলে যে কাহিনী আমি বলেছিলাম তা এখন তোমার কাছে বর্ণনা করছি।পুরাকালে মর্ত্যলোকে এক ব্রাহ্মণী বাস করত। সে প্রত্যহ ব্রত আচরণ ও দেবপূজাপরায়ণা ছিল। উপবাস ক্রমে তার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল।সেই মহাসতী ব্রহ্মণী অন্যের কাছ থেকে দ্রব্যাদি গ্রহণ করে দেবতা, ব্রাহ্মণ, কুমারীদের ভক্তিভরে দান করত। কিন্তু কখনও ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেনি। এইভাবে বহু বছর অতিক্রান্ত হল। আমি চিন্তা করলাম, কষ্টসাধ্য বিভিন্ন ব্রত করার ফলে এই ব্রাহ্মণীর শরীরটি শুকিয়ে যাচ্ছে।সে যথাযথভাবে বৈষ্ণবদের অর্চনও করেছে, কিন্তু তাদের পরিতৃপ্তির জন্য কখনও অন্ন দান করেনি। তাই আমি একদিন কাপালিক রূপ ধারণ করে তামার পাত্র হাতে নিয়ে তার কাছে গিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করলাম।ব্রাহ্মণী বলল-হে ব্রাহ্মণ! তুমি কোথা থেকে এসেছ, কোথায় যাবে, তা আমাকে বলো। আমি বললাম- হে সুন্দরী! আমাকে ভিক্ষা দাও। তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পাত্রে একটি মাটির ঢেলা নিক্ষেপ করল। তারপর আমি সেখান থেকে চলে গেলাম।বহুকাল পরে সেই ব্রাহ্মণী ব্রতপ্রভাবে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করল। মাটির ঢেলা দানের ফলে একটি মনোরম গৃহ সে প্রাপ্ত হল। কিন্তু হে নারদ! সেখানে কোন ধান ও চাল কিছুই ছিল না। গৃহশূন্য দেখে মহাক্রোধে সে আমার কাছে এসে বলল-আমি ব্রত, কৃচ্ছ্রসাধন ও উপবাসের মাধ্যমে নারায়ণের আরাধনা করেছি। এখন হে জনার্দন! আমার গৃহে কিছুই দেখছি না কেন?

হে নারদ! তখন আমি তাকে বললাম- তুমি নিজ গৃহে দরজা বন্ধ করে বসে থাকো। মর্ত্যলোকের মানবী স্বশরীরে স্বর্গে এসেছে শুনে দেবতাদের পত্নীরা তোমাকে দেখতে আসবে। কিন্তু তুমি দরজা খুলবে না।তুমি তাদের কাছে ষটতিলা ব্রতের পুণ্যফল প্রার্থনা করবে। যদি তারা সেই ফল প্রদানে রাজি হয়, তবেই দরজা খুলবে।

এরপর দেবপত্নীরা সেখানে এসে তার দর্শন প্রার্থনা করল। তাদের মধ্যে এক দেবপত্নী তাঁর ষটতিলা ব্রতজনিত পুণ্যফল তাকে প্রদান করল।তখন সেই ব্রাহ্মণী দিব্যকান্তি বিশিষ্টা হল এবং তার গৃহ ধনধান্যে ভরে গেল। দ্বার উদঘাটন করলে দেবপত্নীরা তাকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন।

হে নারদ! অতিরিক্ত বিষয়বাসনা করা উচত নয়। বিত্ত শাঠ্যও অকর্তব্য। নিজ সাধ্যমতো তিল, বস্ত্র ও অন্ন দান করবে। ষটতিলা ব্রতের প্রভাবে দারিদ্রতা, শারীরিক কষ্ট, দুর্ভাগ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই বিধি অনুসারে তিলদান করলে মানুষ অনায়াসে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

## 'ভৈমী' বা 'জয়া' একাদশী

মাঘী শুক্লপক্ষীয়া 'জয়া' একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য ভবিষ্যোত্তর পুরাণে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদরূপে বর্ণিত আছে। শ্রীগরুড়পুরাণে মাঘ মাসের শুক্লাপক্ষীয়া একাদশী তিথিকে 'ভৈমী' একাদশী নামে অভিহিত করা হয়েছে। কল্পান্তরে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন নাম দেখা যায়। পদ্মপুরাণ অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নামই 'পান্ডবা নির্জলা' বা 'ভীমসেনী' (ভৈমী) একাদশী।যুধিষ্ঠির বললেন- হে কৃষ্ণ! আপনি কৃপা করে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর সবিশেষ বর্ণনা করুন।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মহারাজ! মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী 'জয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এই তিথি সর্বপাপবিনাশিনী, সর্বশ্রেষ্ঠা, পবিত্রা, সর্বকাম ও মুক্তি প্রদায়িনী। এই ব্রতের ফলে মানুষ কখনও প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না। এই একাদশীর নিম্নরূপ উপাখ্যান শোনা যায়। একসময় স্বর্গলোকে ইন্দ্র রাজত্ব করছিলেন। সেখানে অন্য দেবতারাও বেশ সুখেই ছিলেন।
তারা পারিজাত পুষ্প শোভিত নন্দনকাননে অস্পরাদের সাথে বিহার করতেন। একদিন পঞ্চাশ কোটি অস্পরা-নায়ক দেবরাজ ইন্দ্র স্বেচ্ছায় আনন্দভরে তাদের নৃত্য করতে বললেন। নৃত্যের সাথে গন্ধর্বগণ গান করতে লাগলেন। পুষ্পদন্ত, চিত্রসেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান গন্ধর্বেরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চিত্রসেনের পত্নীর নাম মালিনী। পুষ্পবন্তী নামে তাঁদের এক কন্যা ছিল। পুষ্পদন্তের পুত্রের নাম মাল্যবান। এই মাল্যবান পুষ্পবন্তীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। পুষ্পবন্তী পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ দ্বারা মাল্যবানকে বশীভূত করেছিল।ইন্দ্রের প্রীতিবিধানের জন্য তারা দুজনেই নৃত্যগীতের সেই সভায় যোগদান করেছিল। কিন্তু একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট থাকায় উভয়েরই চিত্ত বিভ্রান্ত হচ্ছিল। সেখানে তারা পরস্পর কেবল দৃষ্টিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল। ফলে গানের ক্রম বিপর্যয় ঘটল। তাদের এইরকম তাল-মান ভঙ্গভাব দেখে তারা যে পরস্পর কামাসক্ত হয়েছে, দেবরাজ ইন্দ্র তা বুঝতে পারলেন। তখন ক্রোধবশে তিনি তাদের অভিশাপ দিলেন- রে মূঢ়! তোমরা আমার আজ্ঞা লঙঘন করেছ। তোমাদের ধিক! এখনই তোমরা পিশাচযোনী লাভ করে মর্ত্যলোকে নিজ দুষ্কর্মের ফল ভোগ কর। ইন্দ্রের অভিশাপে তারা দুজন দুঃখিত মনে হিমালয় পর্বতে বিচরণ করছিল। পিশাচত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তারা অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে লাগল। হিমালয়ে প্রচন্ড শীতে কাতর হয়ে নিজেদের পূর্বপরিচয় বিস্মৃত হল। এইভাবে অতিকষ্টে সেখানে দিনযাপন করতে লাগল।
একদিন পিশাচ নিজপত্নী পিশাচীকে বলল- সামান্য মাত্র পাপ করিনি। অথচ নরকযন্ত্রণার মতো পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। অতএব এখন থেকে আর কখনও কোন পাপকর্ম করব না। এইভাবে চিন্তা করে তারা সেই পর্বতে মৃতপ্রায় বাস করতে লাগল। মাল্যবান ও পুষ্পবন্তীর পূর্ব কোন পুণ্যবশত সেই সময় মাঘী শুক্লপক্ষীয়া 'জয়া' একাদশী তিথি উপস্থিত হল। তারা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে নিরাহারে নির্জলা অবস্থায় দিবানিশি যাপন করল। শীতের প্রকোপে অনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হল।

পরদিন সূর্যোদয়ে দ্বাদশী তিথি উপস্থিত হল। জয়া একাদশীর দিন অনাহার ও রাত্রি জাগরণে তাদের ভক্তির অনুষ্ঠান পালিত হল। এই ব্রত পালনের ফলে ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় তাদের পিশাচত্ব দূর হল। তারা দুজনেই তাদের পূর্বরূপ ফিরে পেল। তারপর তারা স্বর্গে ফিরে গেল। দেবরাজ তাদেরকে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- কোন পূণ্য ফলে তোমাদের পিশাচত্ব দূর হল। আমার অভিশাপ থেকে কে তোমাদের মুক্ত করল?

মাল্যবান বললেন- হে প্রভু! ভগবান বাসুদেবের কৃপায় জয়া একাদশী ব্রতের পুণ্যপ্রভাবে আমাদের পিশাচত্ব দূর হয়েছে। তাদের কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন- হে মাল্যবান, তোমরা এখন থেকে আবার অমৃত পান কর। একাদশী ব্রতে যাঁরা আসক্ত এবং যাঁরা কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ তাঁরা আমাদেরও পূজ্য বলে জানবে। এই দেবোলোকে তুমি পুষ্পবন্তীর সাথে সুখে বাস কর।

হে মহারাজ! এই 'জয়া' একাদশী ব্রত ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপকেও বিনাশ করে। এই ব্রত পালনে সমস্ত প্রকার দানের ফল লাভ হয়। সকল যজ্ঞ ও তীর্থের পুণ্যফল এই একাদশী প্রভাবে আপনা হতেই লাভ হয়। অবশেষে মহানন্দে অনন্তকাল বৈকুন্ঠ বাস হয়। এই জয়া একাদশী ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

## বিজয়া একাদশী

স্কন্দপুরাণে এই একাদশী মহাত্ম্য এইভাবে বর্ণিত রয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন- হে বাসুদেব! ফাল্‌গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর মাহাত্ম্য অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন।শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে যুধিষ্ঠির! এই একাদশী 'বিজয়া' নামে পরিচিত। এই একাদশী সম্পর্কে একসময় দেবর্ষি নারদ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, তা আমি এখন তোমাকে বলছি। এই পবিত্র পাপবিনাশকারী ব্রত মানুষকে জয় দান করে বলে 'বিজয়া' নামে প্রসিদ্ধ।

পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনি পঞ্চবটী বনে বাস করতেন। সেই সময় লঙ্কাপতি রাবণ দেবী সীতাকে হরণ করে। সীতার অনুসন্ধানে রামচন্দ্র চতুর্দিক ভ্রমণ করতে থাকেন। তখন মৃতপ্রায় জটায়ুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জটায়ু রাবণের সীতাহরণের সমস্ত বৃত্তান্ত রামচন্দ্রকে জানিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এরপর সীতা উদ্ধারের জন্য বানররাজ সুগ্রীবের সাথে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।ভগবান রামচন্দ্রের কৃপায় হনুমান লঙ্কায় গমন করেন। সেখানে অশোক বনে সীতাদেবীকে দর্শন করে শ্রীরাম প্রদত্ত অঙ্গুরীয় (আংটি) তাঁকে অর্পণ করেন।ফিরে এসে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে লঙ্কায় সমস্ত ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন। হনুমানের কথা শুনে রামচন্দ্র সুগ্রীবের পরামর্শে সমুদ্রতীরে যান।

সেই দুস্তর সমুদ্র দেখে তিনি লক্ষ্মণকে বললেন- 'হে লক্ষ্মণ! কিভাবে এই অগাধ সমুদ্র পার হওয়া যায়। তার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।'

উত্তরে লক্ষ্মণ বললেন- 'হে পুরুষোত্তম! সর্বজ্ঞাতা আদিদেব আপনি, আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব? তবে বকদালভ্য নামে এক মুনি এই দ্বীপে বাস করেন। এখান থেকে চার মাইল দূরে তাঁর আশ্রম।
হে রাঘব, আপনি সেই প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠকে এর উপায় জিজ্ঞাসা করুন।' লক্ষ্মণের মনোরম কথা শুনে, তারা সেই মহামুনির আশ্রমে উপনীত হলেন।
ভগবান রামচন্দ্র ভক্তরাজ সেই মুনিকে প্রণাম করলেন। মুনিবর রামচন্দ্রকে পুরাণপুরুষ বলে জানতে পারলেন। আনন্দভরে জিজ্ঞাসা করলেন- হে রামচন্দ্র! কি কারণে আপনি আমার কাছে এসেছেন, তা কৃপা কর বলুন।
শ্রীরামচন্দ্র বললেন- হে মুনিবর! আপনার কৃপায় সৈন্যসহ আমি এই সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়েছি। রাক্ষসরাজের লঙ্কা বিজয় করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।
যাতে এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারি তার উপায় জানবার জন্য আমরা আপনার কৃপা প্রার্থনা করি। মুনিবর প্রসন্নচিত্তে পদ্মলোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন- 'হে রাম! আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে শ্রেষ্ঠ ব্রত করণীয় আমি তা বলছি।
ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের 'বিজয়া' নামক একদশী ব্রতপালনে আপনি নিশ্চয়ই সৈন্যসহ সমুদ্র পার হতে পারবেন। এই ব্রতের বিধি শ্রবণ করুন।
বিজয় লাভের জন্য দশমীর দিন সোনা, রূপা, তামা অথবা মাটির কলস সংগ্রহ করে তাতে জল ও আমপাতা দিয়ে সুগন্ধি চন্দনে সাজিয়ে তার উপর সোনার নারায়ণমূর্তি স্থাপন করবেন।একাদশীর দিনি যথাবিধি প্রাতঃস্নান করে কলসের গলায় মালা চন্দন পড়িয়ে উপযুক্ত স্থানে নারকেল ও গুবাক দিয়ে পূজা করবেন।এরপর গন্ধ, পুষ্প, তুলসী, ধূপ-দ্বীপ নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে পরম ভক্তিসহকারে নারায়ণের পূজা করে হরিকথা কীর্তনে সমস্ত দিন যাপন করবেন। রাত্রি জাগরণ করে অখন্ড ঘি-প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখবেন।দ্বাদশীর দিন সুর্যোদয়ের পর সেই কলস বিসর্জনের জন্য কোন নদী, সরোবর বা জলাশয়ের কাছে গিয়ে বিধি অনুসারে পূজা নিবেদনের পরে তা বিসর্জন দেবেন। তারপর ঐ মূর্তি বেদজ্ঞ ব্রহ্মণকে দান করবেন। এই প্রত প্রভাবে নিশ্চয়ই আপনার বিজয় লাভ হবে।
ব্রহ্মা বললেন- হে নারদ! ঋষির কথামতো ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। সীতাপ্রাপ্তি, লঙ্কাজয়, রাবণবধের মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্র অতুল কীর্তি লাভ করেছিলেন।তাই যথাবিধি যে মানুষ এই ব্রত পালন করবেন তাদের এজগতে জয়লাভ এবং পরজগতে অক্ষয় সুখ সুনিশ্চিত জানবে।হে যুধিষ্ঠির! এই কারণে এই বিজয়া একাদশী ব্রত পালন অবশ্য কর্তব্য। এই ব্রতকথার শ্রবণ-কীর্তন মাত্রেই বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

# আমলকী একাদশী

যুধিষ্ঠির বললেন- হে কৃষ্ণ! মহাফলদাতা বিজয়া একাদশীর কথা শুনলাম। এখন ফাল্‌গুন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী যে নামে বিখ্যাত তা বর্ণনা করুন।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মহাভাগ যুধিষ্ঠির! মান্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বশিষ্ঠ এই একাদশীর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। আপনার কাছে এখন আমি সেই কথা বলছি। এই একাদশীর নাম 'আমলকী' । বিষ্ণুলোক প্রদানকারী রূপে এই একাদশী বিশেষভাবে মহিমান্বিত। একাদশীর দিন আমলকী বৃক্ষের তলে রাত্রি জাগরণ করলে সহস্র গাভী দানের ফল লাভ হয়।
হে পান্‌ডুনন্দন! পূর্বে ব্রহ্মার রাত্রিতে দৈনন্দিন প্রলয় উপস্থিত হলে স্থাবর জঙ্‌গমসহ দেবতা, অসুর ও রাক্ষস সবকিছুর বিনাশ হয়। তখন ভগবান সেই কারণসমুদ্রে অবস্থান করেন। তাঁর মুখপদ্ম থেকে চন্দ্রবর্ণের একবিন্দু জল ভূমিতে পড়ে। সেই জলবিন্দু থেকে একটি বিশাল আমলকী বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষের স্মরণ মাত্র গো-দানের ফল, দর্শনে তাহার দ্বিগুণ এবং এর ফলভক্ষণে তিনগুণ ফল লাভ হয়। এই বৃক্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর সর্বদা অবস্থান করেন। এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখা ও পাতায় ঋষি, দেবতা, ও প্রজাপতিগণ বাস করেন। এই বৃক্ষকে সমস্ত বৃক্ষের আদি বলা হয় এবং তা পরম বৈষ্ণব রূপে ব্রতের একটি অদ্‌ভূত ইতিহাস আপনার কাছে বর্ণনা করছি।প্রাচীনকালে 'বৈদিশ' নামে এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এই নগরে 'চৈত্ররথ' নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। চন্দ্রবংশীয় পাশবিন্দুক রাজার পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিমান ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানেও তিনি ছিলেন সুনিপুন। তার রাজ্যের সর্বত্রই মনোরম আনন্দপূর্ণ এক দিব্য পরিবেশ লক্ষ্য করা যেত। প্রজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ। সকলেই একাদশী ব্রত পালন করতেন। তার রাজ্যে কোন অভাব অমঙ্গল ছিল না। এইভাবে প্রজাদের নিয়ে রাজা চৈত্ররথ সুখে দিনযাপন করতে থাকেন।
একসময় হওয়ায় রাজ্যের সকলেই এই ব্রত পালনের সংকল্প করলেন। ঐদিন প্রাতঃ স্নানের পর প্রজাদের নিয়ে রাজা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে যান। সেখানে সুবাসিত জলপূর্ণ কলস, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা, পঞ্চরত্ন ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে স্থাপন করেন। তারপর ধূপ-দীপ দিয়ে যত্ন সহকারে মুনি-ঋষিদের দ্বারা শ্রীপরশুরাম মূর্তি সমন্বিত আমলকীর পূজা করেন। 'হে পরশুরাম! হে রেণুকার সুখবর্ধক! হে রাত্রি! হে পাপবিনাশিনী আমলকী! তোমাকে প্রণাম। আমার অর্ঘ্যজল গ্রহণ কর।' এইভাবে দিনে যথাবিধি পূজা স্তবস্তুতি নৃত্যগীত করে রাজা ভক্তিভরে সেই বিষ্ণুমন্দিরে রাত্রি জাগরণ করতে লাগলেন।এমন সময় দৈবযোগে একটি ব্যাধ সেখানে উপস্থিত হয়। পূজার সামগ্রী সহ বহু ব্যক্তিকে একত্রে রাত্রি জাগরণ করতে দেখে সে কৌতূহলাক্রান্ত হল। সে ভাবল- এসব কি ব্যাপার? বিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করে সে বসে পড়ল। কলসের উপরে স্থাপিত বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করল। ভগবান বিষ্ণু এবং একাদশীর মাহাত্ম্যও সে মনোযোগ দিয়ে শুনল। সারাদিন ঐ ব্যাধ কিছুই আহার করেনি। এইভাবে ক্ষুধায়

কাতর হয়ে সেখানে সে রাত্রি জাগরণ করল।পরদিন প্রজাসহ রাজা নগরের দিকে যাত্রা করলেন। সেই ব্যাধও তার গৃহে ফিরে গেল। এরপর একসময় ব্যাধের মৃত্যু হল একাদশীতে রাত্রি জাগরণ ব্রত প্রভাবে সেই ব্যাধ পরবর্তী জন্মে এক রাজ্যের অধীশ্বর রূপে নিযুক্ত হল।
জয়ন্তী নামে এক নগরী ছিল। সেখানে বিদূরথ নামে এক রাজা বাস করতেন। ঐ ব্যাধ বিদূরথ রাজার মহাবলী পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম হয় বসুরথ। এক লক্ষ গ্রামের আধিপত্য তিনি লাভ করলেন। তিনি ছিলেন সূর্যের মতো তেজস্বী, চন্দ্রের মতো কান্তিমান ও পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল। বিভিন্ন সদগুণে ভূষিত বসুরথ পরম বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হন।এই মহাদাতা রাজা একবার শিকার করতে গিয়ে পথ ভুলে যান। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে তিনি ক্লান্তিবশতঃ শুয়ে পড়েন। এমন সময় কতগুলি পর্বতনিবাসী ম্লেচ্ছ রাজার কাছে এসে নানাভাবে উৎপীড়ন করতে থাকে। রাজাকে তাদের শত্রু মনে করে তারা হত্যা করতে চেষ্টা করে।
“পূর্বে এই রাজা আমাদের পিতা-মাতা, পুত্র-পৌত্র সবাইকে মেরে ফেলেছে। আমাদের গৃহছাড়া করেছে।” - এইরকম বলতে বলতে ম্লেচ্ছরা রাজাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তারা বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্রে তাঁকে আঘাত করতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজার কোন ক্ষতিই তার সাধন করতে পারেনি। তখন রাজার শরীর থেকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী মূর্তি আবির্ভূতা হন। মহাশক্তিধারিনী ঐ নারী অল্প সময়ের মধ্যেই সকল পাপী ম্লেচ্ছকে নিধন করল। রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল। এই ভয়ানক হত্যাকান্ড দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন- আহা! আমার শত্রুদের হত্যা করে কে আমার প্রাণ রক্ষা করল, এমন কৃপালু কে আছে? আমি তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এমন সময়ে দৈববাণী হল- ভগবান কেশব ব্যতীত শরণাগতকে রক্ষা করবার আর কে আছে? তিনিই শরণাগত পালক। দৈববাণী শুনে তিনি ভক্তিযুক্ত চিত্তে গৃহে ফির এলেন। তারপর প্রজাসহ মহাসুখে ইন্দ্রের মতো নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন।বশিষ্ঠ বললেন- হে রাজন! যে মানুষ এই পরম-উত্তম আমলকী একাদশী ব্রত পালন করেন তিনি নিঃসন্দেহে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।

## পাপমোচনী একাদশী

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন- হে জনার্দন! চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্য কৃপা করে আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির! আপনি ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করেছেন।
একাদশী সকল সুখের আধার, সিদ্ধি প্রদানকারী ও পরম মঙ্গলময়। সমস্ত পাপ থেকে নিস্তার বা মোচন করে বলে এই পবিত্র একাদশী তিথি ‘পাপমোচনী’ নামে প্রসিদ্ধ।রাজা মান্ধাতা একবার লোমশ মুনিকে এই একাদশীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর বর্ণিত সেই বিচিত্র উপাখ্যানটি আপনার কাছে বলছি। আপনি

মনযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করুন।প্রাচীনকালে অতি মনোরম 'চৈত্ররথ' পুষ্প উদ্যানে মুনিগণ বহু বছর ধরে তপস্যা করতেন। একসময় মেধাবী নামে এক ঋষিকুমার সেখানে তপস্যা করছিলেন।মঞ্জুঘোষা নামে এক সুন্দরী অপ্সরা তাঁকে বশীভূত করতে চাইল। কিন্তু ঋষির অভিশাপের ভয়ে সে আশ্রমের দুই মাইল দূরে অবস্থান করতে লাগল। বীণা বাজিয়ে মধুর স্বরে সে গান করত। একদিন মঞ্জুঘোষা মেধাবীকে দেখে কামবাণে পীড়িতা হয়ে পড়ে।এদিকে ঋষি মেধাবীও অপ্সরার অনুপম সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। তখন সেই অপ্সরা মুনিকে নানা হাব-ভাব ও কটাক্ষ দ্বারা বশীভূত করে। ক্রমে কামপরবশ মুনি সাধন-ভজন বিসর্জন দিয়ে তার আরাধ্য দেবকে বিস্মৃত হন। এইভাবে অপ্সরার সাথে কামক্রীড়ায় মুনির বহু বছর অতিক্রান্ত হল।মুনিকে আচার-ভ্রষ্ট দেখে সেই অপ্সরা দেবলোকে ফিরে যেতে মনস্থ করল। একদিন মঞ্জুঘোষা মেধামী মুনিকে বলতে লাগল- হে প্রভু, এখন আমাকে নিজ গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করুন।কিন্তু মেধামী বললেন- হে সুন্দরী! তুমি তো এখন সন্ধ্যাকালে আমার কাছে এসেছে, প্রাতঃকাল পর্যন্ত আমার কাছে থেকে যাও। মুনির কথা শুনে অভিশাপ ভয়ে সেই অপ্সরা আরও কয়েক বছর তার সাথে বাস করল। এইভাবে বহুবছর (৫৫ বছর ৯ মাস ৭ দিন) অতিবাহিত হল। দীর্ঘকাল অপ্সরার সহবাসে থাকলেও মেধাবীর কাছে তা অর্ধরাত্রি বলে মনে হল।

মঞ্জুঘোষা পুনরায় নিজস্থানে গমনের প্রার্থনা জানালে মুনি বললেন- এখন প্রাতঃকাল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্ধ্যাবন্দনা না সমাপ্ত করি, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এখানে থাক।মুনির কথা শুনে ঈষৎ হেসে মঞ্জুঘোষা তাকে বলল- হে মুনিবর! আমার সহবাসে আপনার যে কত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, তা একবার বিচার করে দেখুন। এই কথা শুনে মুনি স্থির হয়ে চিন্তা করে দেখলেন যে, তাঁর ছাপ্পান্ন বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে।মুনি তখন মঞ্জুঘোষার প্রতি ক্রোধ পরবশ হয়ে বললেন- রে পাপীষ্ঠে, দুরাচারিণী, তপস্যার ক্ষয়কারিনী, তোমাকে ধিক্! তুমি পিশাচী হও। মেধাবীর শাপে অপ্সরার শরীর বিরূপ প্রাপ্ত হল। তখন সে অবনতমস্তকে মুনির কাছে শাপমোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করল।

মেধাবী বললেন- হে সুন্দরী! চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া পাপমোচনী একাদশী, সর্বপাপ ক্ষয়কারিণী। সেই ব্রত পালনে তোমার পিশাচত্ব দূর হবে।

পিতার আশ্রমে ফিরে গিয়ে মেধাবী বললেন- হে পিতা! এক অপ্সরার সঙ্গদোষে আমি মহাপাপ করেছি, এর প্রায়শ্চিত্ত কি? তা কৃপা করে আমায় বলুন।উত্তরে চ্যবন মুনি বললেন- চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া পাপমোচনী একাদশী ব্রতের প্রভাবে তোমার পাপ দূর হবে। পিতার উপদেশ শুনে মেধাবী সেই ব্রত ভক্তিভরে পালন করল। তার সমস্ত পাপ দূর হল। পুণরায় তিনি তপস্যার ফল লাভ করলেন। মঞ্জুঘোষাও ঐ ব্রত পালনের ফলে পিশাচত্ব থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য দেহে স্বর্গে গমন করল।

হে মহারাজ! যারা এই পাপমোচনী একাদশী পালন করেন, তাদের পূর্বকৃত সমস্ত পাপই ক্ষয় হয়। এই ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

## কামদা একাদশী

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের 'কামদা' একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য বরাহপুরাণে বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন- হে বাসুদেব! আপনি কৃপা করে আমার কাছে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর মহিমা কীর্তন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মাহারাজ! এই একাদশী ব্রত সম্পর্কে এক বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করছি। আপনি একমনে তা শ্রবণ করুন। পূর্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ মহারাজ দিলীপের কৌতুহল নিবারণের জন্য এই ব্রতকথা কীর্তন করেছিলেন।

ঋষি বশিষ্ঠ বললেন- হে মহারাজ! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম 'কামদা'। এই তিথি পাপনাশক ও পুণ্যদায়িনী। পূর্বকালে মনোরম নাগপুরে স্বর্ণনির্মিত গৃহে বিষধর নাগেরা বাস করত।তাদের রাজা ছিলেন পুন্ডরীক। গন্ধর্ব, কিন্নর ও অস্পরাদের দ্বারা তিনি সেবিত হতেন। সেই পুরীমধ্যে অস্পরা শ্রেষ্ঠ ললিতা ও ললিত নামে গন্ধর্ব স্বামী-স্ত্রী রূপে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ এক গৃহে পরমসুখে দিনযাপন করত।একদিন পুন্ডরীকের রাজসভায় ললিত একা গান করছিল। এমন সময় ললিতার কথা তার মনে পড়ল। ফলে সঙ্গীতের স্বর-লয়-তাল-মানের বিপর্যয় ঘটল। কর্কটক নামে এক নাগ ললিতের মনোভাব বুঝতে পারল।গানের ছন্দভঙ্গের ব্যাপারটি সে পুন্ডরীক রাজার কাছে জানাল। তা শুনে সর্পরাজ ক্রোধভরে কামাতুর ললিতকে- 'রে দুর্মতি! তুমি রাকষস হও' বলে অভিশাপ দান করল।তার হাত দশ যোজন বিস্তৃত, মুখ পর্বত গুহাতুল্য, চোখ দুটি প্রজ্বলিত আগুনের মতো, ঊর্ধ্বে আট যোজন বিস্তৃত প্রকান্ড এক শরীর সে লাভ করল। ললিতের এরকম ভয়ঙ্কর রাক্ষস শরীর দেখে ললিতা মহাদুঃখে চিন্তায় ব্যাকুল হলেন।স্বেচ্ছাচারী রাক্ষস ললিত দুর্গম বনে ভ্রমণ করতে লাগল। ললিতা কিন্তু তার সঙ্গ ত্যাগ করল না। ললিত নির্দয়ভাবে মানুষ ভক্ষণ করত। এই পাপের ফলে তার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। পতির সেই দুরাবস্থা দেখে ব্যথিত চিত্তে রোদন করতে করতে ললিতা গভীর বনে প্রবেশ করল।

একদিন ললিতা বিন্ধ্যপর্বতে উপস্থিত হল। সেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম দর্শন করে মুনির কাছে হাজির হল। তার চরণে প্রণাম করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। মুনিবর জিজ্ঞাসা করলেন- হে সুনদরী! তুমি কে, কার কন্যা, কি কারণেই বা এই গভীর বনে এসেছ? তা সত্য করে বল।তদুত্তরে ললিতা বলল- হে প্রভু! আমি বীরধন্যা গন্ধর্বের কন্যা। আমার নাম ললিতা। আমার পতির পিশাচত্ব দূর হয় এমন কোন উপায় জানবার জন্য এখানে এসেছি।

তখন ঋষি বললেন- চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের কামদা নামে যে একাদশী আছে, তুমি সেই ব্রত যথাবিধি পালন কর। এই ব্রতের পূণ্যফল তোমার স্বামীকে অর্পণ করলে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হবে।
বশিষ্ঠ ঋষি বললেন-হে মহারাজ দিলীপ! মুনির কথা শুনে ললিতা আনন্দ সহকারে কামদা একাদশী পালন করল। তারপর ব্রাহ্মণ ও বাসুদেবের সামনে পতির উদ্ধারের জন্য- 'আমি যে কামদা একাদশীর ব্রত পালন করেছি, তার সমস্ত ফল আমার পতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করলাম।এই পুণ্যের প্রভাবে তাঁর পিশাচত্ব দূর হোক।' এই কথা উচ্চারণ মাত্রই ললিত শাপ মুক্ত হয়ে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হল। পুনরায় গন্ধর্ব দেহ লাভ করে ললিতার সাথে সে মিলিত হল। তারা বিমানে করে গন্ধর্বলোকে গমন করল। হে মহারাজ দিলীপ এই ব্রত যত্নসহকারে সকলেরই পালন করা কর্তব্য। এই ব্রত ব্রম্মহত্যা পাপবিনাশক এবং পিশাচত্ব মোচনকারী। এই ব্রত কথা শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ ও শ্রবণে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

## পদ্মিনী একাদশী

স্মার্তগণ পুরুষোত্তম মাস বা অধিমাসকে 'মলমাস' বলে এই মাসে সমস্ত শুভকার্য পরিত্যাগ করে থাকেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মাসকে পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য অন্য সকল মাস থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করেছেন। তিনি নিজের নামানুসারে এই মাসের নাম 'পুরুষোত্তম' মাস রেখেছেন।
যুধিষ্ঠির বললেন- হে জনার্দন! আমি বহুধর্ম ও ব্রতের কথা শুনেছি। এখন পুরুষোত্তম মাসের সর্বপাপবিনাশিনী ও পুণ্যদায়িনী শুক্লপক্ষীয়া 'পদ্মিনী' একাদশীর কথা আমার কাছে বর্ণনা করুন- যা শ্রবণ করলেন পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন- দশমীর দিন থেকেই ব্রতের শুরু হয়। কাঁসার পাত্রে ভোজন, মসুর, ছোলা, শাক এবং অপরের অন্ন ও আমিষ দশমীর দিন বর্জন করতে হয়।পরের দিন প্রাতঃকৃত্যের পর সুগন্ধী ধূপ, দীপ, চন্দনাদি দিয়ে ভগবানের পূজা করতে হয়। রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ভগবানের নাম, গুণ কীর্তন করতে হয়।এখন এই ব্রতের একটি ইতিহাস আপনার মনোরঞ্জনের জন্য বলছি। পূর্বে পুলস্ত মুনি দেবর্ষি নারদকে এই ইতিহাস বর্ণনা করছিলেন।
একসময় রাজা কার্তবীর্য লঙ্কাপতি রাবণকে পরাজিত করে তাঁর কারাগারে বন্দী করে রাখে। পুলস্ত মুনি রাজার কাছে রাবণের মুক্তি প্রার্থনা করেন। মুনির আজ্ঞায় রাজা রাবণকে মুক্ত করে দেন।এই আশ্চর্যজনক কথা শুনে নারদ পুলস্ত মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন- হে মুনিবর! ইন্দ্রসহ সকল দেবতা যেখানে রাবণের কাছে পরাজিত হয়েছিল সেখানে কিভাবে কার্তবীর্য রাবণকে পরাজিত করল? কৃপা করে তা বলুন। পুলস্ত মুনি তখন নারদের কাছে কার্তবীর্যের জন্ম রহস্য বর্ণনা করেন।

ত্রেতাযুগে হৈহয় বংশে কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। মহিস্মতীপুরে তার রাজধানী ছিল। রাজার এক হাজার পত্নী ছিল। কিন্তু রাজ্যসভার গ্রহণের মতো কোন পুত্র লাভ রাজার ভাগ্যে হয়নি।দেবতাদের আরাধনাতেও সুফল মেলেনি তার। অবশেষে সাধুদের আজ্ঞানুসারে বিভিন্ন ব্রত পালন করলেন। তথাপি রাজা ছিলেন অপুত্রক। মন্ত্রীর ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে তপস্যায় যাবেন বলে স্থির করলেন রাজা কৃতবীর্য।

রাণী মহারাজ হরিশচন্দ্রের কন্যা পদ্মিনী ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা। স্বামীর সঙ্গে তিনিও তপস্যার জন্য মন্দার পর্বতে গমন করলেন। সেখানে তারা দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করলেন। কিন্তু তবুও কৃতবীর্য পুত্রসুখে বঞ্চিতই রইলেন।রাণী পদ্মিনী মহাসাধ্বী অনুসূয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন।- হে সাধ্বী! পুত্র লাভের জন্য আমার স্বামী দশ হাজার বছর তপস্যা করেও বিফল হয়েছে। এখন যে ব্রত পালনে ভগবান প্রসন্ন হন এবং অতিশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ হয়, এমন কোন উপায় বিধান করুন।পদ্মিনীর প্রার্থনায় অনুসূয়া প্রসন্ন হয়ে বললেন- বত্রিশ মাস অন্তরে এক অধিমাস বা পুরুষোত্তম মাস আসে। এই মাসে পদ্মিনী ও পরমা দুই একাদশী। এই ব্রত পালন করলে পুত্রদাতা ভগবান শীঘ্রই প্রসন্ন হবেন।অনুসূয়ার নির্দেশে পদ্মিনী পরম শ্রদ্ধায় এই একাদশী ব্রত পালন করলেন। সেই ব্রতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ভগবান গরুড় বাহনে আরোহন করে পদ্মিনীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

ভগবান বললেন- হে ভদ্রে! আমি প্রসন্ন হয়েছি। পুরুষোত্তম মাসের সমান কোন মাস আমার প্রিয় নয়। এই মাসের একাদশী আমার পরম প্রিয়। তুমি সেই ব্রত যথাযথ পালন করেছ। তাই আমি তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করব।ভগবানের স্তব করে রাণী বললেন- হে ভগবান! আমার স্বামীকে আপনি বরদান করুন। ভগবান তখন রাজার কাছে এসে বললেন- হে রাজেন্দ্র! আপনার অভিলাষিত বর প্রার্থনা করুন। মহানন্দে রাজা বললেন- হে জগৎপতি, মধুসুদন! দেবতা, মানুষ, নাগ, দৈত্য, রাক্ষস আদি কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না, এমন পুত্র আমি প্রার্থনা করি। রাজার প্রার্থনা অনুসারে বরদান করে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। রাজা পত্নীসহ নগরে ফিরে এলেন।যথাসময়ে রাণী পদ্মিনীর গর্ভে মহাবলশালী এক পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ কৃতবীর্য পুত্রের নাম রাখেন কার্তবীর্য। ত্রিলোকে তার সমান কোন বীর ছিল না। তাই দশানন রাবণ যুদ্ধে তার কাছে পরাজিত হয়।শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মহারাজ! এই ব্রত যিনি পালন করবেন, তিনি ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করবেন।শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ধর্মরাজ সপরিবারে এই একাদশী ব্রত পালন করেন। যিনি এই ব্রত মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করেন তিনি বহু পুণ্য লাভ করেন।

## পরমা একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন- হে কৃষ্ণ! পুরষোত্তম মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম কি এবং এর বিধিই বা কি? দয়া করে আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে যুধিষ্ঠির! সুখভোগ, মুক্তি, আনন্দ প্রদানকারী, পবিত্র এবং পাপবিনাশিনী এই একাদশীর নাম 'পরমা' ।পূর্বে বর্ণিত একাদশীর বিধি অনুসারেই এই ব্রত পালন করা কর্তব্য। এখন এই ব্রত বিষয়ে এক মনোহর কাহিনী তোমাকে বলব। কাম্পিল্য নগরে মুনিঋষিদের কাছে আমি তা শুনেছিলাম।
কাম্পিল্য নগরে সুমেধা নামে এক ব্রম্হ্মণ বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল পবিত্রা। তিনি অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। কিন্তু পূর্ব কর্মফলে এই বাহ্মণ ধনহীন হয়ে পড়েন। ভিক্ষা চেয়েও তার কিছুই জুটত না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী নিজ পতির সেবা নিষ্ঠা সহকারে করতেন। গৃহে অতিথিসেবার জন্য প্রয়োজনে অনাহারে থাকতেন। স্বামীকে কখনও বলতেন না যে গৃহে অন্ন নেই। পত্নীর শারিরীক দূরাবস্থার কথা চিন্তা করে ব্রাহ্মণ নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতেন।একদিন পত্নী প্রিয়ংবদাকে বললেন- হে কান্তে! আমি ধনবান মানুষদের কাছেও ভিক্ষা চেয়ে পাই না। বলো এখন আমি কি করব? ধন সংগ্রহের জন্য আমি অন্য কোথাও যেতে চাই। তুমি আমাকে অনুমতি দাও।
ব্রাহ্মণপত্নী তখন তাঁকে বললেন- হে বিদ্বান! এজগতে মানুষ তার পূর্বসঞ্চিত ফল ভোগ করে। পূর্বজন্মের কোন ফল না থাকলে স্বর্ণপর্বতে গেলেও কিছু পাওয়া যাবে না।হে স্বামী, পূর্বজন্মে আমি অথবা আপনি কেউই ধনসম্পদ ইত্যাদি কোন কিছুই সৎপাত্রে দান করিনি। তাই আমাদের ভাগ্যে যা আছে তা এখানে থেকেই লাভ হবে।আপনাকে ছাড়া আমি এক মহুর্তও থাকতে পারব না। কনেনা পতীহীনাকে দুর্ভাগা বলে সবাই তখন নিন্দা করবে। অতএব এখানে যা ধন লাভ হয় তা দিয়ে দিনযাপন করুন।
ঐ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ, পত্নীর কথা শুনে ঐ নগরেই রইলেন। একদিন মুনিশ্রেষ্ঠ কৌন্ডিন্য সেখানে এলেন। তাঁকে দেখে সুমেধা খুব খুশি হলেন। ব্রহ্মণ সস্ত্রীক মুনিকে প্রণাম জানালেন।সুন্দর আসন দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। ঐ দম্পতি প্রণাম জানালেন। সুন্দর আসন দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। ঐ দম্পতি আনন্দ সহকারে মুনিকে ভোজন করালেন।এরপর ব্রাহ্মণপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন- হে মুনিবর! কিভাবে দরিদ্রতা নাশ হয়? বিনা দানে কিভাবে ধন, বিদ্যা, স্ত্রী লাভ হয়? আমার স্বামী আমাকে এখানে রেখে ভিক্ষার জন্য দূর দেশে যেতে চান।কিন্তু আমি তাঁকে যেতে নিষেধ করেছি। এখন আমাদের ভাগ্যবশে এখানে আপনার শুভাগমন হয়েছে। আপনার কৃপায় আমাদের দরিদ্রতা অবশ্যই নাশ হবে। দরিদ্রতা বিনষ্ট হয় এমন কোন ব্রত বা তপস্যার কথা আপনি কৃপা করে আমাদের বলুন।এই কথা শুনে মুনিবর বললেন- হে সাধ্বী! পুরুষোত্তম মাসের কৃষ্ণপক্ষে 'পরমা' নামে সর্বশ্রেষ্ঠা এক একাদশী আছে। এই তিথি ভগবানের অতিব প্রিয়তমা।
এই ব্রত পালনে মানুষ অন্ন, ধনসম্পদ আদি সবই লাভ করে থাকে। এই সুন্দর ব্রত ধনপতি কুবের প্রথম করেছিলেন। রাজা হরিশচন্দ্রও এই ব্রত পালনে স্ত্রী-পুত্র ও রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। হে বিশালাক্ষী! এই জন্য তোমরাও এই ব্রত পালন কর।

হে পান্ডব! কৌন্ডিন্য মুনির উপদেশে পতি-পত্নী উভয়ে একসঙ্গে বিধিমতো পুরুষোত্তম মাসের পরমা একাদশী ব্রত পালন করলেন। ব্রত সমাপনের পর রাজভবন থেকে এক রাজকুমার তাঁদের কাছে এলেন।ব্রহ্মার প্রেরণায় তিনি বহু ধনসম্পদ, নতুন গৃহ ও গাভী এই সম্পতিকে দান করলেন। এই দানের ফলে মৃত্যুর পর সেই রাজা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে পরমা ব্রতের প্রভাবে ব্রহ্মণ-দম্পতির সকল দুঃখের অবসান হল।যে মানুষ এই একাদশী ব্রত পালন না করেন তিনি চুড়াশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করেও কখনও সুখী হয় না। বহু পুণ্য কর্মের ফলে দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ হয়।তাই মানব-জীবনে এই একাদশী ব্রত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এই মাহাত্ম্য শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয়বর্গের সঙ্গে এই ব্রত পালন করেছিলেন।

# অষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রত মাহাত্ম্য

**উন্মীলনী মহাদ্বাদশী**

একাদশী সম্পূর্ণ হয়ে পরের দিন দ্বাদশীতে কলামাত্র বৃদ্ধি পেলে অথচ দ্বাদশীর পরের দিন বৃদ্ধি না পেলে তাকে উন্মীলনী দ্বাদশী বলা হয়। এরকম হলে দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করে ত্রয়োদশীতে পারণ করতে হবে। পদ্মপুরাণে এই মহাদ্বাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।
একসময় অম্বরীশ মহারাজের রাজভবনে গৌতম মুনি উপস্থিত হলে, রাজা প্রফুল্লচিত্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! কর্মবন্ধন মোচন ও বৈকুন্ঠগতি লাভ হয়, এমন কোন বৈষ্ণব ব্রতের কৃথা কৃপা করে আমাকে উপদেশ করুন।
উত্তরে গৌতম ঋষি বললেন- হে রাজন! পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণু আমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং উন্মীলনী ব্রতের উপদেশ করেছিলেন। সেই ব্রত কথা এখন আপনার কাছে বলছি। ত্রিভুবনের সকল তীর্থ, যজ্ঞ, বেদ ও তপস্যা এই ব্রতের কোটি অংশের এক অংশের সমান নয়। যে মাসে উন্মীলনী তিথির আবির্ভাব হয়, সেই মাসে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে যথাবিধি মধুসূদনের পূজা করতে হবে।
হে দেবেশ! হে পুর্ণ্যকীর্তি আপনাকে প্রণাম। আমাকে শোকমোহ ও মহাপাপরূপ সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করুন। আমি শতজন্মে কিঞ্চিৎ পুণ্যও করিনি। তবুও হে জগন্নাথ! আমাকে ভবসাগর থেকে উদ্ধার করুন। আপনার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রদান করুন। কৃপা করে আমার নিবেদিত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। এইভাবে অর্ঘ্য প্রদান করে নৈবেদ্য, স্তব-স্তুতি, আরতি-কীর্তনে ভগবানের প্রীতিসাধন করতে হয়।

এইভাবে অনুষ্ঠিত ব্রতের প্রভাবে ব্রতকারী ধনবান, বিদ্বান, দীর্ঘায়ু, ও পুত্রবান হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হয়েছে যে, এই ব্রতে দান, হোম প্রভৃতি সবই অক্ষয় হয়ে থাকে। এই ব্রত অনুষ্ঠান না করা হলে মানুষকে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

## ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী

সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে একাদশী পূর্ণ হলে এবং দ্বাদশীও পূর্ণ হয়ে তার পরের দিন ত্রয়োদশীতে কিছু অংশ থাকলে ঐ দ্বাদশীকে 'ব্যঞ্জুলী' বলা হয়। এক্ষেত্রে একাদশী না করে ঐ দ্বাদশীতেই উপবাস করতে হবে। পরের দিন দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করতে হবে। ত্রয়োদশীতে পারণ নিষেধ।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে এই দ্বাদশী ব্রত শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এক হাজার অগ্নিষ্টোম থেকে শ্রেষ্ঠ। আবার একটি বাজপেয় এক হাজার অশ্বমেধ থেকে আরও বেশী শ্রেষ্ঠ।একটি পুন্ডরীক এক হাজার বাজপেয় থেকে অধিক ফলবিশিষ্ট। একটি সৌত্রামণি সহস্র পুন্ডরীক থেকে শ্রেষ্ঠ। একটি রাজসূয় এক হাজার সৌত্রামণির চাইতেও শ্রেষ্ঠ।কিন্তু একটি ব্যঞ্জুলী ব্রত সহস্র রাজসূয় অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কলিকালে 'ব্যঞ্জুলী' এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রই শতসহস্র জন্মের পাপক্ষয় হয়ে যায়।শ্রীগুরুদেব খুশি হলে শ্রীহরিও প্রীত হন। অতএব এই তিথিতে শ্রীহরির প্রীতির জন্য শ্রদ্ধাসহকারে গুরুদেবের পূজা করতে হবে। রাত্রি জাগরণ করে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে হবে।

গীতা, বিষ্ণু সহস্র নাম ও শ্রীমদ্ভাগবত যত্নসহকারে পাঠ করা কর্তব্য। নৃত্য, গীত ও সংকীর্তনে শ্রীহরি পরম সন্তুষ্ট হন। এই ব্রত অনুষ্ঠানে সর্বতীর্থে স্নান ও সমস্ত প্রকার দানের ফল লাভ হয়। পূর্ব জন্মার্জিত পর্বত প্রমাণ পাপরাশি এই ব্রত পালনে অচিরেই বিনষ্ট হয়।

## ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী

প্রথমে একাদশী তারপর সমস্ত দিন দ্বাদশী এবং রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হলে তা 'ত্রিস্পৃশা' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। শ্রীহরির বিশেষ প্রিয় এই মহাপূণ্য তিথিতে সযত্নে উপবাস করা কর্তব্য। এই ব্রতের পারণ ত্রয়োদশীতে করতে হয়।

পদ্মপুরাণে শ্রীসনৎকুমার-বেদব্যাস সংবাদে এই ব্রতের মহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সনৎ কুমার বললেন- সর্বপাপবিনাশিনী এই ত্রিস্পৃশা মহাব্রত সকলেরই পালন করা উচিত।চক্রধারী ভগবান বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রে শিব, ব্রহ্মা ও আমার কাছে এই ব্রত সম্পর্কে বলেছিলেন। জড় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিও যদি এই ব্রত পালন করে, তবে তারা মুক্তিলাভের যোগ্য হয়। হে মুনিবর! বারাণসীতে ও প্রয়াগে মৃত্যু হলে এবং গোমতীতে স্নান করলে মানুষের মুক্তি লাভ হয়।

একসময় শ্রীজাহ্নবী ভগবান মাধবের কাছে এসে বললেন- হে হৃষীকেশ! কলিযুগের মহাপাপী মানুষ যখন আমার জলে স্নান করবে, সেই পাপে আমি কলুষিত হয়ে পড়ব। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? শ্রীমাধব বললেন- হে গঙ্গে! সর্বকলুষ বিনাশী এই ত্রিস্পৃশা ব্রত তুমি পালন কর। ভগবানের নির্দেশে গঙ্গাদেবী এই ত্রিস্পৃশা ব্রত পালন করে কলির কলুষ থেকে মুক্ত হন।

হে মুনিবর! বিষয় অনুরাগী ব্যক্তি কিংবা বিষয় অনাসক্ত, উভয়ের পক্ষে মুক্তি লাভ করা কঠিন। তাই মুক্তিদানকারী এই ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

## পক্ষবর্ধিনী মহাদ্বাদশী

অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা সম্পূর্ণ হয়ে প্রতিপদে কিছুমাত্র থাকলে তার পূর্বের দ্বাদশী তিথির নাম 'পক্ষবর্ধিনী' । এই অবস্থায় একাদশীর দিন উপবাস না করে দ্বাদশীতেই উপবাস করতে হয়।অনন্ত কলুষ বিনাশকারী এই দ্বাদশী পরিত্যাগকারীকে বহু বছর নরকে বাস করতে হয়। যে মাসে পক্ষবর্ধিনী হয়, শ্রীহরির সেই মাসের নাম অনুসারে তাঁকে ভক্তিসহকারে পূজা করতে হয়।

সংসারার্ণবপোতায় পাপকক্ষামহানল।
নরকাগ্নিপ্রশমন জন্মমৃত্যুজরাপহ।।
মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিতং ভবসাগরে।
গৃহাণার্ঘ্য ময়া দত্তং পদ্মনাভ নমোহস্তু তে।।"

'হে জগন্নাথ! আপনি এই সংসার সমুদ্রের নৌকাস্বরূপ পাপরূপ তৃণের জন্য মহা অনল, নরক অগ্নির প্রশমনকারী, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির মোচনকারী। তাই ভবসাগরে পতিত আমাকে আপনি কৃপা করে উদ্ধার করুন। হে পত্মনাভ। আমার নিবেদন এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। আপনাকে আমি প্রাণাম জানাই।'

এইভাবে শ্রীহরিকে অর্ঘ্য নিবেদন করে নৈবেদ্য ও সুস্বাদু ফলমূল অর্পণ করতে হয়। নিজ সামর্থ মতো যত্ন সহকারে শ্রীহরির গুণকীর্তন ও রাত্রিজাগরণে এই ব্রত পালন করতে হয়। এই ব্রত পালনে দশ হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়ে থাকে।

## জয়া মহাদ্বাদশী

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবশিষ্ঠ-মান্ধাতা সংবাদে এই মহাদ্বাদশীর কথা বলা হয়েছে। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে 'পুনর্বসু' নক্ষত্র যুক্ত হলে তাকে সর্বোত্তমা 'জয়া' মহাদ্বাদশী বলা হয়। এই ব্রত উপবাসে ভয়ঙ্কর নরকযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভ হয় এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

## বিজয়া মহাদ্বাদশী

শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হলে সেই মহা পবিত্র দ্বাদশীকে 'বিজয়া' বলা হয়। ভাদ্র মাসের বুধবারে বিজয়া ব্রত হলে সমস্ত ব্রত থেকে এই ব্রতের মাহাত্ম্য অধিক হয়। এই তিথি আবার শ্রবণ-মহাদ্বাদশী নামেও পরিচিত হয়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে এই ব্রতের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই তিথিতে পবিত্র তীর্থ স্নানে সমস্ত তীর্থ-স্নানের ফল পাওয়া যায়। সারা বৎসরের পূজার ফল কেবল এই ব্রত পালনেই লাভ হয়। এই দিনে একবার মাত্র ভগবানের নাম জপে এক হাজার বার জপের ফল অর্জিত হয়। এই তিথিতে দান, বৈষ্ণবভোজন, হোম, উপবাসে হাজার গুণ বেশি ফল লাভ হয়ে থাকে।

## জয়ন্তী মহাদ্বাদশী

শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হলে সেই পবিত্র দ্বাদশীকে 'জয়ন্তী' বলা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, সমস্ত পাপহরণকারী এই তিথিতে শ্রীহরির পূজাসহকারে ব্রত- উপবাসে সাত জন্মের পাপ দুর হয়ে যায়। যে মানুষ বেঁচে থাকতেও এই ব্রত পালন করে না, তার জীবন বৃথা। এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা বিশেষভাবে করতে হয়।

অবতারসহস্রাণি করোষি মধুসূদন।
ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি।।
দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতৃরুৎসঙ্গসংস্থিতম্।।
বাঞ্চিতং কুরু মে দেব দুস্কৃতং চৈব নাশয়।
কুরুষ্ব মে দয়াং দেব সংসারর্তি-ভয়পহ।।

'হে মধুসূদন! আপনি অসংখ অবতার গ্রহণ করেন। জগতে এমন কেই নেই যে আপনার সেসকল অবতারের গণনা করতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মাদি দেবতাদের কাছেও আপনার স্বরূপ অজ্ঞাত।

জননীর কোলে অবস্থানরত আপনাকে আমি পূজা করি। হে দেব! হে ভবভয় মোচনকারী, আমার দুস্কৃতি নাশ অভীষ্ট প্রদান করে আমাকে কৃপা করুন।

এইভাবে ভক্তিসহকারে জয়ন্তী মহাদ্বাদশী পালন করলে একুশ পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। শ্রীহরির অত্যন্ত প্রীতিকর এই ব্রতের অনুষ্ঠানে সকল মনোবাসনা পূর্ণ ও বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

## পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী

শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে পুষা-নক্ষত্রের যোগ হলে সেই দ্বাদশীকে 'পাপনাশিনী' বলা হয়। ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে, মহাপুণ্য স্বরূপিণী এই তিথিতে মহারাজ সগর, ককুৎস্থ, ধন্ধুমার ও গাধি শ্রীহরির উপাসনা করে সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন। এই ব্রত উপবাসে কায়িক, বাচিক, মানসিক, সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। পুষা-নক্ষত্রযুক্তা এই দ্বাতশীর উপবাসে এক হাজার একাদশীর ফল লাভ হয়ে থাকে। এই তিথিতে স্নান, দান, জপ, হোম, বেদধ্যয়ন আদি অনন্তগুণ ফল প্রদান করে।
যারা কোন জাগতিক ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না, তারা শ্রীহরির প্রীতিবিধানের জন্য এই ব্রত উপবাস পালন করবেন।

# তুলসী মাহাত্ম্য-বৃক্ষ হয়েও তুলসী কেন পূজনীয়া ?

মন্দির প্রাঙ্গণে ও গৃহাঙ্গনে পবিত্র তুলসী বৃক্ষ রাখা, তাঁর পূজা-পরিক্রমা করা, কন্ঠে তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করা হিন্দুদের বিশেষত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীন সংস্কৃতি। কিন্তু কেন বৃক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তুলসীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়, এ বিষয়টি অনেকেরই অজানা। তাই এই প্রবন্ধে তুলসীর কী পরিচয়? ভূমন্ডলে তুলসীর আবির্ভাব কীভাবে হলো? তুলসী কীভাবে বৃক্ষে পরিণত হলো? তুলসী কেন বৃক্ষ হয়েও জগৎপূজিতা? তুলসী কাষ্ঠের মালা কন্ঠেধারণের কী আবশ্যকতা? ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

**তুলসীর পরিচয়/তুলসী মূলত কে?**

সাধারণ বিচারে তুলসী (Tulsi/Holy/Basil/ thai Krapho) একটি  Lamiaceae পরিবারের অন্তর্গত এক সুগন্ধি ও ঔষধি উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Ocimum sanctum ( sanctum অর্থ পবিত্র স্থান) কল্প কল্প ধরে প্রায় প্রতিটি হিন্দু গৃহে পবিত্র বৃক্ষরূপে পূজিত হয়ে আসছে। মূলত, তুলসী হলেন লক্ষীদেবীর তথা শ্রীমতি রাধারাণীর অংশস্বরূপা সখী ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। গোলোক বৃন্দাবনে (চিন্ময়জগতে) গোপিকা বৃন্দাদেবীরূপে তুলসী রাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবিকা এবং তাদের বিচিত্র দিব্য লীলা সম্পাদনের মূল পরিচালিকা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দূতী, কুঞ্জাদি সংস্কারে অভিজ্ঞা ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পন্ডিতা। তিনি সমস্ত দেবীগণের মধ্যে পবিত্ররূপা এবং সমুদয় বিশ্বের মধ্যে তাঁর তুলনা নেই বলে তিনি তুলসী নামে কীর্তিতা (ব্র.বৈ.পু. প্রকৃতিখন্ড, ২২.২৪, ৪২)।
<u>ব্রহ্মকৈবর্তপুরাণে</u> তুলসীকে 'সীতাস্বরূপা', <u>স্কন্দপুরাণে</u> 'লক্ষীস্বরূপা', চর্কসংহিতায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া', <u>ঋকবেদে</u> 'কল্যাণী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আর কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী বলে তাকে ভক্তিদেবী বা ভক্তিজননী বলেও সম্বোধন করা হয়। বৃন্দাদেবীর আজ্ঞাক্রমেই বৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প, ফল, ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-শারী ইত্যাদি পশুপাখিরাও চিরবসন্ত শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জে পরম রমণীয় শোভা ধারণ করে। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বায়ম্ভূব মন্বন্তরের প্রথম পাদে তিনি কেদার রাজার কন্যারূপে বৃন্দাদেবী নামে যজ্ঞকুন্ড থেকে আবির্ভূত হন। তিনি যে বনে তপস্যা করেছিলেন তাই জগতে বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ হয়। শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামীকৃত 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' অনুসারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় বৃন্দাদেবী মুকুন্দ দাসরূপে আবির্ভূত হন।

এই বৃন্দাদেবী এবে কৈল আগমন।
শ্রীমুকুন্দ দাস নামে দিল দরশন।
-ভক্তামৃত লহরী

আবার, এই বৃন্দাদেবীই অন্য এক স্বরূপে অভিরামশক্তি শ্রীমতি মালিনীদেবী রূপে আবির্ভূত হন। ব্রজে বৃন্দা সমজ্ঞাতা ইদানিং মালিনী স্মৃতা।। (শ্রীঅভিরাম লীলামৃত, ৭ম পরিচ্ছেদ) গৌড়ীয় আচার্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল রূপ গৌস্বামীপাদ 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা' গ্রন্থে বৃন্দাদেবীর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন- "শ্রীমতি বৃন্দাদেবীর দেহকান্তি মনোহর ও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়; নীল বসন পরিধানে মুক্ত ও পুষ্প দ্বারা বিভূষিতা। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রভানু, মাতা ফুল্লরা, পতির নাম মহীপাল ও ভগিনী মঞ্জরী। শ্রীমতি বৃন্দাদেবী বৃন্দাবনে সর্বদাই বাস করেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নানাবিধ লীলার দূতী এবং লীলারসে সর্বদাই সমুৎস্যুক, উভয়ের মিলনকার্যে প্রেমে পরিপূর্ণা থাকেন এই বৃন্দাদেবী।" বৃন্দাদেবীর প্রতি অনুগত্য ও তাঁর কৃপা ভিন্ন বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবাধিকার কদাপি কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট তুলসী পরম আদরণীয়া, শ্রদ্ধার্হ ও পূজনীয়া।

## দেবীর আর্বিভাব লীলা

---

## বৃক্ষমবৈবর্তপুরাণ অনুসারে

একদিন গোলকে (স্বর্গে) তুলসীকে কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত দেখে রাধিকা তুলসীকে অভিশাপ দেন যে, "তুমি মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করবে"। এতে কৃষ্ণ দুঃখিত হয়ে তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তপস্যা দ্বারা আমার একাংশ প্রাপ্ত হবে। রাধিকার শাপে তুলসী পৃথিবীতে রাজা ধর্ম ধর্ব্বজের ও মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুলসী নামে অভিহিত হন। অত:পর তুলসী বনগমণ করে ব্রহ্মার কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন,তার কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা স্থির থাকতে না পেরে তাকে বর দিতে সম্মত হন। তুলসী বলেন তিনি নারায়ণকে স্বামীরূপে কামনা করেন। ব্রক্ষ্মা বলেন এখন তুমি কৃষ্ণের অংশ সুদামের স্ত্রী হও। পরে কৃষ্ণকে লাভ করবে। রাধিকার শাপে সুদাম দানবরূপে জন্মগ্রহণ করবে, তার নাম হবে শঙ্খচূড়। নারায়ণের শাপে তুলসী বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করবে। তুমি না জন্মগ্রহণ করলে তার সকল পূজা ব্যর্থ হবে। যথা সময়ে শঙ্খচূড়ের সঙ্গে রাজা ধর্ম ধর্ব্বজের কন্যা তুলসীর বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল যে, "তার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হলেই তার মৃত্যু হবে"। শঙ্খচূড়ের উৎপাত ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মার সহিত শিবের নিকট গিয়ে উপস্হিত হন। শিব তখন সকলের সঙ্গে নারায়ণের সমীপস্হ হন। দেবতাদের দুর্দশা দর্শনে নারায়ণ বললেন যে, শূল দ্বারা শিব যুদ্ধে রত হলে তারপর আমি এর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করব। শিব শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে শঙ্খচূড়ের স্ত্রীর সাথে ছলনা করব।

তখন শিবের হাতে শঙ্খচূড় নিহত হয়। তার অস্হি লবন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে এই অস্হি হতে দেব পূজার জন্য নানা প্রকার শঙ্খের উৎপত্তি হয়। নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ গ্রহণপূর্বক তার সতীত্ব নষ্ট করেছেন জ্ঞাত হয়ে তুলসী নারায়ণকে অভিশাপ দেন যে, তুমি পাষানে পরিনত হও। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তুলসী নারায়ণের চরনে

পতিত হন। তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে নারায়ণ বললেন যে,তোমার দেহ থেকে গন্ডকী নদী উৎপন্ন হবে। আর তোমার কেশ থেকে উৎপন্ন হবে তুলসীবৃক্ষ।

তুমি লক্ষ্মীর ন্যায় আমার প্রিয়া হবে। তুলসী নারায়ণকে গৃহে স্হান দিতে বললে নারায়ন বলেন, আমার গৃহে লক্ষ্মী রয়েছে, তোমার গৃহে নয় গৃহাঙ্গনে হবে। সেই থেকে নারায়ণ শিলারূপে অবস্হিত হয়ে সর্বদা তুলসীযুক্ত হয়ে থাকেন।

**পদ্মপুরাণ অনুসারে**

পদ্মপুরাণে তুলসী সম্বন্ধে এই রূপ বৃত্তান্ত কথিত আছে- জলন্ধর নামে এক অসুরের স্ত্রী ছিলেন বৃন্দা। জলন্ধর ইন্দ্রকে পরাস্ত করে অমরাবতী অধিকার করলে, ইন্দ্র শিবের শরনাপন্ন হন। শিব জলন্ধরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে পতিপরায়ণা বৃন্দা স্বামীর প্রানরক্ষার জন্য বিষ্ণু পূজায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বিন্দার নিকট এলে স্বামীকে অক্ষত দেহে ফিরে আসতে দেখে, বৃন্দা অসমাপ্ত বিষ্ণু পূজা ত্যাগ করে আসায় জলন্ধরের মৃত্যু হয় ( অন্য মতে বৃন্দার সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতে জলন্ধরের মৃত্যু হবে না জেনে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরে বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। বৃন্দা সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। সতীর সাপ অমোঘ জেনে বিষ্ণু ভীত হন এবং বৃন্দাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, তুমি সংযত হও তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ এই চারিপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। বৃন্দা হতেই তুলসীর জন্ম।

**তুলসী কীভাবে বৃক্ষে পরিণত হলো?**

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, প্রকৃতিখন্ডে, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর নিকট তুলসীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। নারয়ণের বর্ণনানুসারে, একসময় দক্ষসাবর্ণি নামক মনুর বংশোদ্ভুত রাজা ধর্মধ্বজ লক্ষীদেবীর উপাসনা করেছিলেন। লক্ষীদেবী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বরদান করেন। ফলে, ধর্মধ্বজরাজের পত্নী মাধবী লক্ষীর অংশরূপিণী মনোহরা এক পদ্মিনী কন্যা প্রসব করেন।

চম্পকবর্ণা সুকেশী মনোহরা অপূর্ব সুন্দরীকন্যাকে দর্শন করে নরনারীগণ তাঁর তুলনা দিতে অক্ষম হয়েছিলেন বলে পুরাবিদ পন্ডিতগণ তাঁকে 'তুলসী' নামে অভিহিত করেন। পরবর্তীকালে তুলসী যোগ্যা স্ত্রীর ন্যায় তপস্যার জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে "মম নারায়ণঃ স্বামী ভবিতেতি" অর্থাৎ "নারায়ণ আমার স্বামী হোন" এরূপ সংকল্পপূর্বক দৈবপরিমাণে লক্ষ বছর ধরে কঠোর তপস্যায় রত থকেন।

তখন ব্রহ্মা তাঁকে বর প্রার্থনা করার নির্দেশ দিলে তুলসী ব্রহ্মাকে বলেন, "আমি গোলোকধামে গোপী রূপে শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপা এবং তাঁর প্রিয়া ও সখী। রাসেশ্বরী

শ্রীমতি রাধারাণীর অভিলাষে ও শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে আমি মর্ত্যে মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করেছি। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণপূর্বক তাঁরই অংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে আমার পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করার নির্দেশ দেন।

দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণে আমার যেরূপ অভিলাষ, চতুর্ভূজ নারায়ণে সেরূপ নেই। তথাপি কৃষ্ণসন্তুষ্টিহেতু আমাকে এই বর দিন, যেন আমি নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করতে পারি এবং রাধারাণীরও প্রিয়া হতে পারি।ব্রহ্মা তুলসীকে রাধার মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ, পূজাবিধানসহ তাঁর মনোপূত বর প্রদান করেন। তবে, নারায়ণ প্রাপ্তির পূর্বে ব্রহ্মা তাঁকে শঙ্খচূড়ের পত্নীরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করার নির্দেশ প্রদান করে অন্তর্হিতহন।
শঙ্খচূড় গোলোকবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অংশপ্রকাশ সুদামাসখারূপে নিত্য বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধারাণীর অভিশাপে তিনি শঙ্খচূড় রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্র.খন্ড, ২০,২১ অধ্যায়) শঙ্খচূড় শিবের কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, যতদিন তার পত্নী তুলসী সতীত্ব বজায় থাকবে, ততদিন তাকে কেউ বধ করতে পারবে না। এরপর দেবতাদের অজেয় শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় কৃষ্ণাংশ ভগবান শ্রীবিষ্ণু শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে তুলসীকে তার পূর্বকৃত তপস্যার ফলদান তথা পতিসঙ্গ দান করেন; ফলে শঙ্খচূড় নিহত হন।

তুলসী যদিও পূর্বে ভগবানকে পতিরূপে লাভ করতে চেয়েছিলেন, তবুও সেসময় তার বর্তমান পতিবিয়োগ ও বিষ্ণুর এ আপাত ছলনা সইতে না পেরে তিনি তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ক্রোধ সংবরন  করতে না পেরে তিনি বিষ্ণুর এ আচরণকে পাষাণ হৃদয় বিবেচনা করে তাঁকে পাষাণ (পাথর) হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন এবং তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। পরে তুলসী তার ভুল বুঝতে পারেন যে, তিনি ভগবানের প্রতি অভিশম্পাত করছেন।

তখন ভগবানও তুলসীকে বরদান করেন। শ্রীবিষ্ণুর বরে সাধ্বি তুলসী দেহত্যাগের পর দিব্যদেহ ধারণপূর্বক গোলোকে শ্রীকৃষ্ণকে  পতিরূপে প্রাপ্ত হন; তাঁর শরীর ভারতে গন্ডকী নামে প্রসিদ্ধা, মনুষ্যগণের পুণ্যপ্রদা পবিত্রা নদীরূপে পরিণত হয় এবং তাঁর কেশকলাপ তুলসী কেশসম্ভুতা বলে তুলসী নামে বিখ্যাত পবিত্র বৃক্ষরূপ ধারণ করে। অচিন্ত্য (চিন্তার অতীত) শক্তিধর নটোবর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ আপন ভগবত্ত্বা বলে রাসলীলায় নিজেকে অসংখ্যরূপে বিস্তার করেছিলেন, তথাপি তিনি এক, তদ্রুপ বৃন্দাদেবীও পরবর্তীকালে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিবলে এক হয়েও সুন্দরী, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, বৈকুন্ঠ ও আমার সন্নিধানে তুলসীবৃক্ষ সমুদয় পুষ্প হতে শ্রেষ্ঠ হবে। তুলসী তরুমূলে সমূদয় তীর্থের অধিষ্ঠান থাকবে।”

## তুলসী কেন বৃক্ষ হয়েও জগৎপূজিতা?

পূর্বোল্লেখিত আলোচনায় এটা অবশ্যই স্পষ্ট হয়েছে যে, তুলসী কোনো সাধারণ বৃক্ষ নয়। মূলত, তিনি এ জড়জগতের উর্ধ্বে অবস্থিত চিন্ময় গোলোকবৃন্দাবন ধামে নিত্য বাসরতা কৃষ্ণপ্রেয়সী এবং রাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবিকা। তবুও বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা করতে, বিশেষ কিছু ঘটনাকে নিমিত্ত করে তিনি এজগতে বৃক্ষরূপে প্রকটিত হয়েছেন। মূর্তিমান দেবী হয়েও গঙ্গা-স্বরস্বতী যেরূপ যুগপৎ নদীরূপে বিদ্যমান, তদ্রুপ তুলসী গোলোক নিবাসী গোপিকা হয়েও যুগপৎ বৃক্ষরূপে বিদ্যমান।

তাই তাঁর পূজাকে যদি কেউ সাধারণ বৃক্ষপূজা বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তা নেহাৎ অজ্ঞতা। তুলসী ভক্তিদেবী বিধায় তাঁর নিত্য পূজার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবশ্যই ভক্তি লাভ হয়। ব্যবহারিক অনুশীলন না করলে কখনোই তা কারো অনুভূত হবে না, ঠিক যেমন মধুর বোতল লেহন করলে কখনো মধুর স্বাদ পাওয়া যায় না। তাই জীবশিক্ষার নিমিত্তে ভগবান শ্রীনারায়ণ স্বয়ং এ তুলসী পূজা প্রচলন করেন। তুলসী পূজা প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বহু প্রমাণ রয়েছে, যার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরা হলোঃ

## তুলসী পূজা কেন করবেন? তার শাস্ত্র প্রমাণ!

**ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণঃ** ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (প্রকৃতিখন্ড, ২২ অধ্যায়) অনুসারে, একসময় দেবী তুলসী অভিমান বশত অন্তর্হিত হলে তুলসীবনে গমনপূর্বক শ্রীহরি তুলসীর পূজা ও স্তব করেন। তখন দেবী তুলসী বৃক্ষ হতে আবির্ভূতা হন এবং শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণ নেন। সেখানে এও বলা হয়েছে, যে মানব হরিপ্রণীত মন্ত্ররাজ পাঠ করত ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ, সিঁদুর, চন্দন, পুষ্প, নৈবেদ্য ও অন্যান্য উপহার দ্বারা যথাবিধি তুলসীর পূজা করবেন, তিনি সর্বসিদ্ধি লাভ করবেন।

**পদ্মপুরাণঃ** পদ্মপুরাণের উত্তরখন্ডে (অধ্যায় ২৩) মহাদেব নারদমুনিকে সম্বোধন করে বলেন-তুলসী সম্বন্ধীয় পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, শাখা, ত্বক, স্কন্ধ এবং মৃত্তিকাদি সমস্তই পবিত্র। যে গৃহে তুলসী-বৃক্ষ অবস্থিত, তার দর্শন-স্পর্শনেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিলয়প্রাপ্ত হয়। যে যে গ্রহে, গ্রামে বা বনে তুলসী বৃক্ষ বিরাজ করে, জগৎপতি শ্রীহরি প্রীতচিত্তে সেই সেই ক্ষেত্রে বাস করেন। পদ্মপুরাণ,

সৃষ্টিখন্ডে (অধ্যায়-৬০) সমস্ত পত্র পুষ্প মধ্যে মঙ্গলময়ী তুলসীই সাধুতমা। তা সর্বমঙ্গলপ্রদা, শুদ্ধা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভক্তিমুক্তিপ্রদা, মুখ্যা এবং সর্বলোক মধ্যে পরম শুভা। যেখানেই তুলসী বন, সেখানেই ভগবান কেশব (কৃষ্ণ) এবং সেখানেই ব্রহ্মা, কমলা (লক্ষী) ও অন্য সমস্ত দেব সন্নিহিত। অতএব, তুলসী দেবীকে সর্বদাই পূজা করবে। পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখন্ডে (অধ্যায়- ৬১.৫-৬)-তুলসী নামোচ্চারণমাত্রই

মুরারি হরি প্রীতি লাভ করেন, পাপসকল বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং অক্ষয় পূণ্য লাভ হয়ে থাকে- এমন তূলসীকে লোকে কেন পূজা-বন্দনা করবে না?

নিত্যং যস্তুলসী দত্ত্বা পূজয়েন্মাঞ্চ মানবঃ।
লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।।
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখন্ড ২১.৪৫)

"যে মানব প্রত্যহ তুলসীপত্র দ্বারা আমাকে পূজা করবেন, নিশ্চয়ই তার লক্ষ অশ্বমেধের ফল হবে।" এভাবে শাস্ত্রে তুলসীপূজার বহু মাহাত্ম কীর্তিত হয়েছে। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সর্বদা তুলসীকে সামনে রেখে হরিনাম জপ করতেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর, শিব-পার্বতী, এমনকি শ্রীমতি রাধারাণী তুলসী সেবা আচরণের মাধ্যমে জীবকে তা অনুসরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং, কৃষ্ণভক্তি লাভেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নিয়মিত তুলসীদেবীর আরাধনা করা।

## রূপভেদ

রাধাকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া ও সেবিকা **তুলসী** তথা **বৃন্দাদেবী** জগতের কল্যাণে বিভিন্ন যুগে ও মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্নভাবে এ মর্তে আবির্ভূত হন। তুলসীর আবির্ভাব সম্পর্কে পুরাণে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। একই তুলসীদেবী কখনো জলন্ধরের পত্নী, কখনো শঙ্খচূড়ের পত্নী, আবার কখনো বা ধর্মদেবের পত্নী, কখনো ধর্মধ্বজ কন্যা, কখনো চন্দ্রভানু কন্যা, আবার কখনো কেদাররাজের কন্যারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই জেনে রাখা দরকার যে, এই প্রত্যেক কন্যাই এক বৃন্দাদেবী এবং প্রত্যেক জন্মেই তিনি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ছিলেন।

## বৃন্দা

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (শ্রীকৃষ্ণজন্মখন্ড, ৮৬ অধ্যায়) উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজের এক প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হে ব্রজরাজ, সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রথম পাদে স্বয়ম্ভুব মনু ও শতরূপার দুইপুত্র হয়-প্রিয়ব্রত ও উত্তাপনপাদ। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। ধ্রুব মহারাজের পুত্র নন্দসাবর্ণি, তাঁর পুত্র কেদার রাজ। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। একসময় কেদার রাজার যজ্ঞকুন্ড থেকে লক্ষীদেবীর অংশরূপে এক কন্যা আবির্ভূত হন (কমলা কলয়া জাতা যঞ্জকুন্ড সমুদ্ভবা। বহ্নিশুদ্ধাং শকধানা রত্নভূষণ ভূষিতাস এবং সে কন্যা কেদার রাজ ও তাঁর পত্নীকে তাঁর পিতা-মাতারূপে গ্রহণ করেন। পিতামাতাকে অবগত করে সেই কন্যা তপস্যার উদ্দেশ্যে যমুনার তীরবর্তী রমণীয় পূণ্য বনে গমন করেন। ঐ কেদারকন্যার নাম ছিল বৃন্দা। তাই, তার পপোবন বলে সেই বন জগতে বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ হয়।

## ধর্মধ্বজরাজের কন্যা

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, প্রকৃতিখন্ডে, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর নিকট তুলসীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। নারয়ণের বর্ণনানুসারে, একসময় দক্ষসাবর্ণি নামক মনুর বংশোদ্‌ভুত রাজা ধর্মধ্বজ লক্ষীদেবীর উপাসনা করেছিলেন। লক্ষীদেবী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বরদান করেন। ফলে, ধর্মধ্বজরাজের পত্নী মাধবী লক্ষীর অংশরূপিণী মনোহরা এক পদ্মিনী কন্যা প্রসব করেন। চম্পকবর্ণা সুকেশী মনোহরা অপূর্ব সুন্দরীকন্যাকে দর্‌শন করে নরনারীগণ তাঁর তুলনা দিতে অক্ষম হয়েছিলেন বলে পুরাবিদ পন্ডিতগণ তাঁকে ‘তুলসী’ নামে অভিহিত করেন।

## শঙ্খচূড়ের পত্নিরূপে

শঙ্খচূড় গোলোকবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অংশপ্রকাশ সুদামাসখারূপে নিত্য বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধারাণীর অভিশাপে তিনি শঙ্খচূড় রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্র.খন্ড, ২০,২১ অধ্যায়) শঙ্খচূড় শিবের কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, যতদিন তার পত্নী তুলসী সতীত্ব বজায় থাকবে, ততদিন তাকে কেউ বধ করতে পারবে না। এরপর দেবতাদের অজেয় শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় কৃষ্ণাংশ ভগবান শ্রীবিষ্ণু শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে তুলসীকে তার পূর্বকৃত তপস্যার ফলদান তথা পতিসঙ্গ দান করেন; ফলে শঙ্খচূড় নিহত হন।

## গন্ডকী নদী ও তুলসী বৃক্ষরূপে

শঙ্খচূড়ের পত্নি তুলসী যখন পতিবিয়োগ ও বিষ্ণুর ছলনা বুঝতে পারলেন তিনি তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ওপর অত্যন্ত ক্‌রুদ্ধ হন। ক্রোধ সংবরন করতে না পেরে তিনি বিষ্ণুর এ আচরণকে পাষাণ হৃদয় বিবেচনা করে তাঁকে পাষাণ (পাথর) হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন এবং তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। পরে তুলসী তার ভুল বুঝতে পারেন যে, তিনি ভগবানের প্রতি অভিশম্পাত করছেন। তখন ভগবানও তুলসীকে বরদান করেন।

শ্রীবিষ্ণুর বরে সাধ্বি তুলসী দেহত্যাগের পর দিব্যদেহ ধারণপূর্বক গোলোকে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন; তাঁর শরীর ভারতে গন্ডকী নামে প্রসিদ্ধা, মনুষ্যগণের পুণ্যপ্রদা পবিত্রা নদীরূপে পরিণত হয় এবং তাঁর কেশকলাপ তুলসী কেশসম্‌ভুতা বলে তুলসী নামে বিখ্যাত পবিত্র বৃক্ষরূপ ধারণ করে।

## অভিশাপ

ধর্মরাজের মেয়ে তুলসী এমন রূপসী এবং উচ্চমার্গের সাধিকা ছিলেন যে বহু দেবতাই তাঁকে প্রেমিকা হিসাবে পেতে চাইতেন। কিন্তু, তুলসী ছোটবেলা থেকেই ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। তাই তাঁকে ঘাটাতে কেউ সাহস করত না। তুলসী একদিন গঙ্গা নদীর তীরে ধ্যানমগ্ন গণেশের মুখোমুখি হলেন। গণেশের অনিন্দ্যকান্তি রূপে মুগ্ধ হয়ে যান তুলসি। তিনি জানতেন না, যাঁকে দেখে তাঁর হৃদয়ে বাধ ভাঙা প্রেম এসেছে, তিনি আসলে গণেশ, যিনি শিব ও পার্বতীর পুত্র। গণেশকে দেখে প্রেমে পাগল তুলসী শুধু যে নির্লজ্জের মতো এগিয়ে গেলেন তাই নয়, গণেশের কাছে প্রেম নিবেদন করে তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু গণেশ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি যাঁকে বিয়ে করবেন তাঁকে পার্বতীর মতো গুণসম্পন্না হতে হবে, এবং মাতা পার্বতী যেভাবে পিতা শিবের সেবা করেন, তাঁর স্ত্রীও সেভাবে সেবা করবেন বলে তিনি আশা করেন। এমন বাক্যে যারপরনাই অপমানিত বোধ করেন তুলসী।

তিনি তৎক্ষণাৎ গণেশকে অভিশাপ দেন যে, তাঁকে তাঁর অপছন্দের পাত্রীকেই বিয়ে করতে হবে। এতে গণেশও খেপে যান। তিনিও পাল্টা তুলসীকে শাপ দিয়ে বলেন, তাঁর বিয়ে অসুরের সঙ্গে হবে। অভিশাপ পেয়ে ভেঙে পড়েন তুলসী। বুঝতে পারেন, তিনি পার্বতী ও শিব নন্দনকে শাপ দিয়ে কতবড় বিপদ ডেকে এনেছেন। গণেশকে বোঝাতে থাকেন তুলসী। মন শান্ত হলে গণেশও তুলসীর অবস্থা অনুধাবন করেন এবং শাপ কাটানোর উপায় বাতলে দেন। গণেশ বলেন, তাঁর দেওয়া শাপ একমাত্র কাটাতে পারেন খোদ বিষ্ণু। তাঁর দেওয়া আশীর্বাদে তুলসী দেবী রূপে গণ্য হবেন। তবে, গণেশের আশপাশও তিনি মাড়াতে পারবেন না। সারাজীবনই তুলসীকে গণেশের থেকে দূরে থাকতে হবে। গণেশকে নিয়ে যা কিছু পূজার্চনা হবে তার কোনওটাতেই তুলসী থাকবেন না। এরপর গণেশের অমতেই তাঁর বিয়ে হয়। তুলসীর সঙ্গে বিয়ে হয় অসুর বীর শঙ্খচূড়ার সঙ্গে। তবে, শঙ্খচূড়ার অত্যাচারে ক্ষিপ্ত শিব তাঁকে হত্যা করেন।

## তুলসীমালা কেন ধারণ করবেন?

নিজেকে বিশেষভাবে উপস্থাপনের জন্য অধুনা নরনারীর দেহে নানারকম অলংকার দেখা যায়- বিভিন্ন কাষ্ঠনির্মিত, মৃত্তিকা বা ধাতুনির্মিত ও মানু ুষের হাড়-কংকাল আকৃতির নানারক অলংকার। কিন্তু এসব উদ্ভট সাজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ সহজতর হলেও এর মাধ্যমে আত্মিক কল্যাণ সাধনের কোনো সুযোগ আছে কি?

অথচ বৈদিক শাস্ত্রে এ ব্যাপারেও স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এবং তা আধুনিক অন্তঃসারহীন লোকরঞ্জনের  জন্য নয়, বরং তা ধারণের মাধ্যমে আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। তুলসীমালা তার মধ্যে অন্যতম। এখন

প্রশ্ন হলো তুলসীমালা ধারণের কী আবশ্যকতা রয়েছে? তুলসীমালা না পড়ে কি সাধু হওয়া যায় না? শাস্ত্রে কোথায় আছে যে, তুলসীমালা ধারণ করতে হবে? উত্তরে সহজভাবে বলা যায়, ঠিক যেমন পুলিশের পোশাক না পড়েও কেউ পুলিশ হতে পারে, কিন্তু কেউ পুলিশ কি না তা তার পোশাকের মাধ্যমে সহজে চিহ্নিত করা যায়, একইভাবে কারো গলায় তুলসীমালা দেখে সহজে বোঝা যায় যে, তিনি বৈষ্ণম।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, কুকুরের গলায় বেল্ট থাকলে যেমন বোঝা যায় যে, তার মালিক আছে, তখন কেউ তাকে উত্যক্ত বা তার ক্ষতি করে না। একইভাবে, কারো গলায় তুলসীমালা দেখে বোঝা যায় যে, তিনি ভগবানের ভক্ত, আর ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে যমদূতেরা কখনো তাকে স্পর্শ করে না।

তাছাড়া, একথা অনস্বীকার্য যে, বাহ্যিক বেশভূষা অবশ্যই ব্যক্তির মনে প্রভাব ফেলে। যেমন, সাধারণ ঘরোয়া পোশাক পরিহিত অবস্থায় মনোভাব একরকম থাকে, আবার, একই ব্যক্তি যখন প্যান্ট, শার্ট, কোট, স্যু, হাতে ঘড়ি, গলায় টাই পড়বে, তখন তা অবশ্যই তার মনে ব্যতিক্রম প্রভাব ফেলবে। এ ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে আজই পরীক্ষা করে যাচাই করতে পারেন। তেমনি, কেবল বাহ্যিক বেশভূষার ওপর কারো সাধুতা নির্ভর না করলেও, মনে সাধুভাব বজায় রাখতে তা অবশ্যই সাহায্য করে।

এছাড়া, তুলসী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। তাই ভগবানের অতি প্রিয় তুলসী গলায় ধারণ করার মাধ্যমে কেউ তুলসীদেবীর কৃপায় ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ তথা কৃপার পাত্র হতে পারেন, ঠিক যেমন কারো সন্তানকে ভালোবাসার মাধ্যমে সেই সন্তানের মায়ের ভালোবাসা অর্জন করা যায় বা প্রিয় পাত্র হওয়া যায়। শাস্ত্রানুসারে, তুলসীর সমস্ত কিছুই পবিত্র। তাই তুলসীমালা ধারণের মাধ্যমে আমরা পবিত্র হই। পবিত্র তুলসীমালা ধারণকারী ব্যক্তির স্নানকালে প্রতিবার গঙ্গা স্নানের ফল লাভ হয়, কারণ তুলসী গঙ্গার ন্যায় পবিত্র। তদুপরি, শাস্ত্রে তুলসীর মহিমা বর্ণনের পাশাপাশি তুলসীমালা ধারণের বহু নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলোঃ

## তুলসী সেবা কীভাবে করবেন?

শ্রীল রূপ গোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে স্কন্দপুরাণের উদ্‌ধৃতি দিয়ে নানা প্রকার তুলসীসেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-"যাঁর দর্শনে পাপ ও রোগ নাশ হয়, স্পর্শের ফলে শরীর শুদ্ধ হয়, জল সিঞ্চন করার ফলে ভয় দূর হয়, রোপণ করার ফলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করার ফলে পূর্ণ ভগবৎপ্রেম লাভ করা যায় (উল্লেখ্য যে, দ্বাদশীতে তুলসীপত্র চয়ন নিষিদ্ধ),

সেই তুলসীদেবীর চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" আরো বলা

হয়েছে, "তুলসী সর্বমঙ্গলময়ী। তাঁকে দর্শন করলে, স্পর্শ করলে, স্তবন করলে, বন্দনা করলে, তাঁর মহিমা শ্রবন করলে অথবা রোপণ করলে সবরকমের কল্যাণ লাভ করা যায়। এই প্রকার বিধির মাধ্যমে তুলসীদেবীর সেবা করলে নিত্যকাল বৈকুণ্ঠজগতে বাস করা যায়।" তুলসীদেবীর কৃপা লাভের আরেকটি বিশেষ পন্থা হলো তুলসী প্রদক্ষিণ। প্রদক্ষিণের এ পদ্ধতি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। তাই বিভিন্ন ধর্মে প্রদক্ষিণের রীতি দেখা যায়। মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক (যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদি কানি চ। তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে□) নিষ্ঠাসহকারে তুলসী প্রদক্ষিণ কালে ব্যক্তির চিত্ত ভক্তিজননী তুলসীদেবীর প্রতি নিবিষ্ট হয়। শ্রদ্ধা ও ভগবদ্ভক্তি নিশ্চিতরূপে বর্ধিত হয় এবং চিত্ত স্থির হওয়ার ফলে আধ্যাত্মিক মার্গে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায়।

তুলসী মালা কেন ধারণ করবেন, তার শাস্ত্র প্রমাণ।
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণঃ
**তুলসীকাষ্ঠনির্মাণমালাং গৃহ্নাতি যো নরঃ।**
**পদে পদেহশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্।।**
**(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখন্ড-২১.৪৭)**
**"যে নর তুলসীকাষ্ঠ-নির্মিত মালা ধারণ করবেন, নিশ্চয়ই তাঁর পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হবে।"**

**স্কন্দপুরাণঃ** "ভগবান বললেন, যে মানব তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূত মাল্য ধারণ করেন, আমি প্রত্যহ তাকে দ্বারকাবাসের ফল পদান করি। যে নর ভক্তিসহকারে আমার উদ্দেশ্যে তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভুত মাল্য প্রদান করে ভক্তিপূর্বক তা গ্রহণ করেন, তার কোনো পাতক নেই, তার প্রতি আমি অত্যন্ত প্রীত এবং তিনি আমার প্রাণ সদৃশ। যিনি তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভুত মাল্যে ভূষিত হয়ে পিতৃ ও দেবগণের পূজা প্রভৃতি পুণ্য কার্য করেন, তার কোটিগুণ পূণ্য হয়ে থাকে।

**তুলসীকাষ্ঠমালাং তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।**
**দৃষ্টা নশ্যতি দূরেণ বাতোদ্‌ধূতং যথা দলং।।১২।।**
**তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতো ভ্রমতে ভুবি।**
**দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শত্রুবৎ ক্বচিৎ।।১৪।।**
যমদূতগণ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত মাল্য দর্শন করে বায়ুচলিত পত্রের ন্যায় দূর হতে পলায়ন করে। যিনি তুলসীকাষ্ঠ মাল্যে ভূষিত হয়ে বসুধা বিচরণ করেন, কখনো তাঁর দুঃস্বপ্ন, দুর্নিমিত্ত বা শত্রুজনিত ভয় থাকে না।

**ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবৃদ্ধয়ঃ।**
**নরকান্ন নিবর্তন্তে দগ্ধা কোপাগ্নিনা মম।।১৫।।**

যেসকল হেতুবাদী পাপবুদ্ধি লোক তুলসীমালা ধারণ করে না, আমার কোপাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়ে তারা কখনো নরক হতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। অতএব, তুলসীমাল্য ধারণ করবে।"(স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখন্ড, মার্গশীর্ষমাসমাহাত্ম্য, ৪.৭-১৫)।

**পদ্মপুরাণঃ** তুলসী কাষ্ঠের মহিমা প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে (উত্তরখন্ডে অধ্যায় ২৩) বলা হয়েছে-"তুলসী মাষ্ঠানলে যাদের দেহ দগ্ধ হয় এবং মৃতব্যক্তির সর্বাঙ্গে তুলসীকাষ্ঠ দিয়ে পশ্চাৎ যে ব্যক্তি তাকে দাহ করেন, তারা সকলেই পাপ হতে মুক্ত হয়ে থাকে।"

**তুলসীকাষ্ঠমালাস্তু কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।**
**অপ্যশৌচহপ্যনাচারো ভক্ত্যা যাতি হরের্গৃহম্।।**
(পদ্মপুরাণ, স্বর্গখন্ড, ৪৭.৪৫)
"যে তুলসীকাষ্ঠমালা কন্ঠস্থ করে বহন করে, সে অশৌচ বা অনাচার হলেও হরির গৃহে (বৈকুন্ঠে) যায়।"
**যঃ পুনস্তুলসীমালাং কন্ঠে কৃত্বা জনার্দনম্।**
**পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতি প্রতিপুষ্পং গবাযুতম্।।৪৮।।**
**ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।**
**নরকান্ন নিবর্তন্তে দগ্ধা কোপগ্নিনা হরেঃ।।৪৯।।**

"যে মানব তুলসীমালা কন্ঠে করে জনার্দনের পূজা করে, সে প্রতি পুষ্পে গবাযুতের (অযুত গোদানের) পুণ্য প্রাপ্ত হয়। যেসকল পাপবুদ্ধি ব্যক্তি নানা কারণ দর্শিয়ে তুলসীমালা ধারণ করে না, তারা হরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে নরক হতে প্রত্যাবৃত হতে পারে না।
নিবেদ্য কেশবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্। বহতে যো নরো ভক্ত্যা
তস্য বৈ নাস্তি পাতকম্৫২ তুলসীকাষ্ঠমালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ। দৃষ্টা নশ্রতি দূতগণ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত মাল্য দর্শন করে বায়ুচলিত শুল্ক পত্রের ন্যায় দূরে অন্তর্হিত হয়।" অতএব, মানুষ্য মাত্রেরই ভগবানকে নিবেদিত তুলসীকাষ্ঠমালা কন্ঠে পরিধান করা কর্তব্য।

## পূজা-পদ্ধতি, প্রার্থনা ও আরতি

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (প্রকৃতিখন্ড, ২২ অধ্যায়) অনুসারে, একসময় দেবী তুলসী অভিমান বশত অন্তর্হিত হলে তুলসীবনে গমনপূর্বক শ্রীহরি তুলসীর পূজা ও স্তব করেন। তখন দেবী তুলসী বৃক্ষ হতে আবির্ভূতা হন এবং শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণ নেন। সেখানে এও বলা হয়েছে, যে মানব হরিপ্রণীত মন্ত্ররাজ পাঠ করত ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ, সিঁদুর, চন্দন, পুষ্প, নৈবেদ্য ও অন্যান্য উপহার দ্বারা যথাবিধি তুলসীর পূজা করবেন, তিনি সর্বসিদ্ধি লাভ করবেন।

**পদ্মপুরাণ** :পদ্মপুরাণের উত্তরখন্ডে (অধ্যায় ২৩) মহাদেব নারদমুনিকে সম্বোধন করে বলেন-তুলসী সম্বন্ধীয় পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, শাখা, ত্বক, স্কন্ধ এবং মৃত্তিকাদি সমস্তই পবিত্র। যে গৃহে তুলসী-বৃক্ষ অবস্থিত, তার দর্শন-স্পর্শনেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিলয়প্রাপ্ত হয়। যে যে গ্রহে, গ্রামে বা বনে তুলসী বৃক্ষ বিরাজ করে, জগৎপতি শ্রীহরি প্রীতচিত্তে সেই সেই ক্ষেত্রে বাস করেন।

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখন্ডে (অধ্যায়-৬০) সমস্ত পত্র পুষ্প মধ্যে মঙ্গলময়ী তুলসীই সাধুতমা। তা সর্বমঙ্গলপ্রদা, শুদ্ধা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভক্তিমুক্তিপ্রদা, মুখ্যা এবং সর্বলোক মধ্যে পরম শুভা। যেখানেই তুলসী বন, সেখানেই ভগবান কেশব (কৃষ্ণ) এবং সেখানেই ব্রহ্মা, কমলা (লক্ষী) ও অন্য সমস্ত দেব সন্নিহিত। অতএব, তুলসী দেবীকে সর্বদাই পূজা করবে।

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখন্ডে (অধ্যায়- ৬১.৫-৬)-তুলসী নামোচ্চারণমাত্রই মুরারি হরি প্রীতি লাভ করেন, পাপ সকল বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং অক্ষয় পূণ্য লাভ হয়ে থাকে- এমন তূলসীকে লোকে কেন পূজা-বন্দনা করবে না?

নিত্যং যস্তুলসী দত্ত্বা পূজয়েন্মাঞ্চ মানবঃ।
লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখন্ড ২১.৪৫)

বঙ্গানুবাদঃ যে মানব প্রত্যহ তুলসীপত্র দ্বারা আমাকে পূজা করবেন, নিশ্চয়ই তার লক্ষ অশ্বমেধের ফল হবে।”

**তুলসী-প্রদক্ষিণ মন্ত্রঃ**

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি তানি প্রনশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥

অর্থঃ যখন মানুষ শ্রীমতী তুলসীদেবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার কৃত সকল পাপকর্ম, এমন কি ব্রহ্মহত্যার পাপও বিনষ্ট হয়ে যায়। তারপরে বাঁ হাতে পঞ্চপাত্র ধারণ করে তা থেকে ডান হাত দিয়ে শ্রীমতি তুলসীদেবীকে জল সিঞ্চন করতে হয়।

**তুলসী প্রাণম মন্ত্রঃ**

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসী দৈব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।
বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

**তুলসী জাগরণ মন্ত্রঃ**

উত্তিষ্টং তুলসীদেবী গাত্রোত্থানাং কুরু যথা।
অরুণোদয় প্রাতঃ প্রীচরণে প্রণমাম্যহম্।।

## তুলসী জলদান মন্ত্রঃ

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্ ।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনীম্ ॥

## তুলসীর মূল লেপন মন্ত্রঃ

তুলসী নিপয়তে গঙ্গা স্থানেমেকং বারাণসী।
সেবনে পঞ্চতীর্থানি তুলসীভ্যাং নমো নমঃ।।
তুলসী ত্বং সদা ভক্তা সর্বতীর্থফলং ভবেৎ।
লেপনাৎ তব মূলঃ সর্বপাপে প্রমুচ্যতে।।
তন্মুলে সর্বতীর্থানি তৎপত্রে সর্বদেবতা।
তদঙ্গে সর্বপুণ্যানি কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনীং।।

## তুলসী চয়ন মন্ত্রঃ

ওঁ তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া ।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥

## তুলসীর স্তুতিঃ

মহাপ্রসাদ জননী সর্বসৌভাগ্যবর্ধিনী।
আধিব্যাধিহরি নিত্যং তুলসী ত্বং নমোহস্তুতে।।

## তুলসীর ধ্যানঃ

তুলসী সর্বভূতানাং মহাপাতকনাশিনী।
স্বর্গাপবর্গদে দেবী বৈষ্ণবানাং প্রিয়ে সদা।।
সত্যে সত্যবতীচৈব ত্রেতায়াং মানবী তথা।
দ্বাপরে অবতীর্ণাসি বৃন্দা ত্বং তুলসী কলৌ।।

## শ্রী শ্রী তুলসী আরতি-

নমো নমঃ তুলসী ! কৃষ্ণপ্রেয়সী।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাসী॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন বাসী।
মোর এই অবিলাস, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী।

দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসী॥

## তুলসী দেবীর অভিষেক কী ভাবে করবেন

### ১। দেবী তুলসীকে সর্বদা প্রসন্ন করার জন্য অভিষেক:

প্রতি দিন স্নানের পর সিক্ত বস্ত্রে একটি ঘটিতে গঙ্গাজল অথবা পরিষ্কার জল নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করুন:

মন্ত্র: 'নমঃ তুলসী কল্যাণী নমো বিষ্ণুপ্রিয়ে শুভে। নমো মোক্ষপ্রদে দেবী নমঃ সম্পৎপ্রদায়িকে'।

ফল: এই মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে জল ধীরে ধীরে তুলসী মূলে ঢেলে দিয়ে অভিষেক সম্পন্ন করলে মাতা তুলসী সর্বদা প্রসন্না থাকবেন এবং তাঁর আশীর্বাদে ধনসম্পদ এবং মোক্ষ লাভ হয়।

### ২। মনকে পবিত্র রাখার জন্য অভিষেক:

একটি ঘটিতে পরিষ্কার জল নিয়ে তার মধ্যে অল্প পরিমাণ কাঁচা দুধ দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে সেই মিশ্রণটি নিয়ে উল্লেখিত মন্ত্রটি পাঠ করুন:

মন্ত্র: তুলসী পাতু মাং নিত্যং সর্বাপৎভোপি সর্বদা। কীর্তি তাপি স্মৃতা বাপি পবিত্রতি মানবম্।

ফল: এই মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যম তুলসী গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়ে অভিষেক সম্পন্ন করতে হবে। মাতা তুলসীর আশীর্বাদে সর্বদা চিত্ত প্রফুল্ল এবং পবিত্র থাকবে।

### ৩। গৃহের পরিবেশ শুদ্ধ রাখার জন্য অভিষেক:

একটি ঘটিতে পরিষ্কার জল নিয়ে তার মধ্যে অল্প কাঁচা দুধ এবং সামান্য পরিমাণে কেশর দিয়ে ভাল করে মিলিয়ে নিন। এর পর মিশ্রণটি নিয়ে মন্ত্র পাঠ করুন:

মন্ত্র: তুলসী নাপরং কিঞ্চিদ্দৈবতং জগতী তলে। ময়া পবিত্রতো লোকো বিষ্ণুণা বৈষ্ণবো যথা।।

ফল: এই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে তুলসী গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়ে অভিষেক সম্পন্ন করতে হবে। মা তুলসীর করুণায় সমস্ত পরিবেশ শুদ্ধ এবং শান্তিময় হয়ে উঠবে।

### ৪। অবিবাহিতা মহিলাদের বিবাহের জন্য অভিষেক:

একটি ঘটিতে পরিষ্কার জল নিয়ে তার মধ্যে অল্প কাঁচা দুধ এবং সামান্য কাঁচা হলুদ বাটা অথবা হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে মিলিয়ে নিন। এর পর এই মন্ত্র পাঠ করুন:

মন্ত্র: তুলস্যাঃ পল্লবং বিষ্ণাঃ শিরস্যারোপতিং কলৌ। আনরাপয়তি সব্বানি শ্রেয়ানি বরমস্তকে।

ফল: এই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে তুলসী গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়ে অভিষেক সম্পন্ন করতে হবে। এই অভিষেকের ফলে বিষ্ণু তথা বিষ্ণুপ্রিয়ার আশীর্বাদে বিবাহ ত্বরান্বিত হবে।

**৫। বিদ্যার্থীদের পূর্ণ বিদ্যালাভের জন্য অভিষেক:**

একটি ঘটিতে গঙ্গাজল নিয়ে তার মধ্যে সামান্য পরিমাণে গোরোচন এবং গব্য ঘি দিয়ে ভাল করে মিলিয়ে নিতে হবে। এর পর মিশ্রণটি বিদ্যার্থী অথবা তার পরিবর্তে অন্য কেউ নিয়ে নিয়ে মন্ত্র পাঠ করুন:

মন্ত্র: তুলসী শ্রীর্মহালক্ষ্মীবিদ্যাবিদ্যা যশস্বিনী। ধর্ম্ম্যা ধর্ম্মাননা বৃন্দা দেবদেবমনঃ প্রিয়া।

ফল: এই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে তুলসী গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়ে অভিষেক সম্পন্ন করতে হবে। মাতা তুলসীর আশীর্বাদে বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভে ক্রমোন্নতি হবে।

## নিষেধ

- সকালে সূর্যোদয়ের আগে কিংবা সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পরে, এবং দ্বাদশী তিথিতে কখন ও তুলসীপত্র চয়ন করতে নেই।
- আগের কিংবা সকালে তোলা তুলসীপত্র শুকিয়ে গেলেও, তা শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনায় ব্যবহার করা চলে। সকালে ভক্তের উচিত কয়েকটি তুলসী গাছ রাখা। তবে খুব সতর্কতার সাথে এগুলোর যত্ন করতে হবে। কারণ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী। তুলসী গাছ গুলো এমন যায়গায় রাখতে হবে যাতে মানুষ অথবা পশু তাঁর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে না পারে, তাঁকে দুমরে মুচরে দিতে না পারে। মঞ্জরী গুলো কচি সময় হাত দিয়ে (নখ দিয়ে নয়) ভেঙ্গে দিলে গাছটি অত্যন্ত সুস্থও সবল ভাবে বেড়ে উঠবে।
- শ্রীমতী তুলসীদেবীর যাতে কোনও প্রকার ব্যথা সৃষ্টি না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। ডান হাত দিয়ে তাঁর পত্র চয়ণের সময়ে বামহাত দিয়ে শাখাটিকে ধরে রাখতে হয় যাতে সেটি ভেঙ্গে না যায়। তুলসী পত্র চয়ণের শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। শুধুমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহসমূহ ও চিত্রপটসমূহের প্রতি তুলসী চরণে তুলসী চরণে নিবেদন করা যায় না। ভগবানকে ভোগ নিবেদনের সময় প্রত্যেক সামগ্রীতে একটি করে তুলসী পাতা বা মঞ্জরী দিতে হয়।

- শ্রীগোবিন্দের চরণ ব্যতীত তুলসীপত্র অর্পণ করতে নেই। গুরুদেব ভগবানের মতো শ্রদ্ধেয় হলেও তিনি কখনই ভগবান নন৷ তিনি ভগবানের প্রিয় সেবকমাত্র৷ তিনি ভগবানের ভক্ত৷ আর তুলসী হচ্ছেন গোবিন্দবল্লভা, শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। একমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত কারও চরণে তুলসীপত্র অর্পণ করা কখনই উচিত নয়, কারণ তা মহা অপরাধ। শ্রীঅনন্ত সংহিতা শাস্ত্রে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে-

**তুলস্যা বিষয়ং তত্ত্বং বিষ্ণুমেব সমর্চয়েৎ।**
**সা দেবী কৃষ্ণশক্তিহি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা॥**
**অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নান্যপদে সমর্পয়েৎ।**
**অর্পণে তত্ত্বহানিংঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ॥**
**অতত্ত্বজ্ঞস্ত পাষণ্ডো গুরুব্রুবস্য পাদয়োঃ।**
**অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জয়েন্নরকং পদম্॥**

**বঙ্গানুবাদঃ** তুলসীপত্র দিয়ে শ্রীবিষ্ণু তত্ত্বের অর্চনা করা কর্তব্য। তুলসীদেবী কৃষ্ণশক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। তিনি পরম বৈষ্ণবী। অন্য কারও পদে তুলসীপত্রাদী অর্পণ করা উচিত নয়৷ যদি কেউ অর্পণ করে তবে সে তত্ত্বজ্ঞানহীন হয় এবং তার সেবা অপরাধ হয়৷ আর যে তত্ত্বজ্ঞানহীন পাষণ্ড গুরুদেবের চরণে তুলসী অর্পণ করে তার নরকগতিই লাভ হয়৷ যে ব্যক্তি চরণে তুলসীপত্র গ্রহণ করে সে কখনই গুরু নয়৷ সে পরমগুরুরত্ত বিরাধী৷

ভগবান শ্রীহরি ছাড়া কোনও দেবদেবীকে তুলসীপত্র দিয়ে কখনই অর্চনা করা উচিত নয়। বায়ুপুরাণে মহর্ষি ব্যাসদেব সেই কথা উল্লেখ করেছেন

**তুলসীদল মাত্রায় যোহন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।**
**ব্রহ্মহা স হি গোঘ্নশ্চ স এব গুরুতল্পগঃ॥**

**বঙ্গানুবাদঃ** যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা অন্য দেবদেবীর পূজা করে তার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা ও গুরুপত্নী গমনের পাপ অর্জিত হয়ে থাকে৷

## তুলসী মাল্য গলায় ধারণ করার উপকারিতা কী ?

সঙ্গত উল্লেখ্য —তুলসী বৃক্ষ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিকট অতি পবিত্র। প্রায় সব হিন্দু বাড়িতে আপনি তুলসী গাছ দেখতে পাবেন। শাস্ত্র মতে,এটি বৃন্দা দেবীর প্রতীকী রূপ। তুলসিপত্র বিষ্ণুপূজার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। তুলসী মূলের মৃত্তিকা দিয়ে বৈষ্ণবগণ তিলক করে থাকেন। সমস্ত তুলসী বৃক্ষই হিন্দুদের নিকট পূজনীয়।

মৃত তুলসীর কাষ্ঠ দিয়েই নির্মিত হয় তুলসী মাল্য।তুলসী পবিত্র বৃক্ষ। তাই এর স্পর্শ অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য হয়। তুলসী কাঠের ১০৮টি গুটি একসাথ করে জপমালা তৈরি হয়।যা দিয়ে ভক্তগণ নিত্য হরির নাম জপ করে। বৈষ্ণবরা গলায় তুলসী কন্ঠি ধারণ করেন। এটি মনে এক প্রশান্তির সৃষ্টি করে। ধারণকারী পবিত্র অনুভব লাভ করেন।

**গলায় তুলসী মালা পরিধান করলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়—**

●তামসিক আহার পরিত্যাগ করতে হয় (নেশাদ্রব্য , নিকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও প্রানীহত্যা করে প্রাপ্ত খাদ্য নিষিদ্ধ)

●মিথ্যা বলা যাবে না।

● হরিস্মরণ ও হরিনাম জপ করতে হবে (পরমেশ্বরকে স্মরণে রাখতে হবে)।

এসকল বিষয় পরিত্যাগ এর ফলে ধারণকারী পবিত্রতা অর্জন করেন। ফলে মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়।

**এককথায় বলা যায়, তুলসীমালা ধারণে মনে পবিত্র অনুভূতি আসে, পরমেশ্বর এর প্রতি ভক্তি জাগ্রত হয়।** ধর্মীয় বিশ্বাসে, এর অনেক তাৎপর্য রয়েছে।বলা হয়, যে সতত তুলসী মাল্য ধারণ করেন, মৃত্যুর পর তাকে যম দূতগণ স্পর্শ করে না। তিনি ভগবান বিষ্ণুর ধাম বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।

# কিছু প্রণাম মন্ত্র

১।গুরু প্রণাম মন্ত্রঃ

"ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মিলিত যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ।।

২।শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্রঃ

"হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগত্পথে।গোপেশ গোপীকা কান্ত রাধা কান্ত নমহস্তুতে ।।"

৩। শ্রী রাধারানী প্রণাম মন্ত্রঃ

"তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গীং রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।

বৃষভানু সূতে দেবী তাং প্রণমামি হরি প্রিয়ে।।"

৪। শ্রী পঞ্চতত্ত্ব প্রনাম মন্ত্রঃ

""পঞ্চতত্ত্ব আত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্ ।ভক্ত অবতারং ভক্তাখ্যাং নমামি ভক্ত শক্তিকম্ ।।""

৫। পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্রঃ

" জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত্ব গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ"

৬। হরিনাম মহামন্ত্রঃ

" হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।"

৭। শ্রী পিতার প্রনাম মন্ত্রঃ

"পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমং তপ।

পিতোরি প্রিতিমা পন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ।। "

৮। শ্রীমাতার প্রনাম মন্ত্রঃ

"মাতা জননী ধরিত্রী, দয়াদ্র হৃদয়া সতী।

দেবীভ্যো রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোশা সর্ব দুঃখ হারা।।"

৯। শ্রী বৈষ্ণব প্রণাম মন্ত্রঃ

"বাঞ্ছাকল্প তরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যে নমো নমঃ"

১০। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের প্রণাম মন্ত্রঃ

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যানাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।"

১১। তুলসী প্রণাম মন্ত্রঃ

"বৃন্দায়ৈ তুলসী দৈব্যে প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।

কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবৈত্যেঃ নমঃ নমঃ ।

১২। তুলসী জলদান মন্ত্রঃ

"গোবিন্দ বল্লভাং দেবী ভক্ত চৈতন্য কারিনী।

স্নাপযামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী।।"

১৩। তুলসী পত্র চয়ন মন্ত্রঃ

""ওঁ তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।

কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥"

১৪। তুলসীদেবীর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা মন্ত্রঃ

"চয়নোদ্ভবদুঃখং চ যদ্ হৃদি তব বর্ততে।
তত্ ক্ষমস্ব জগন্মাতঃ বৃন্দাদেবী
নমোহস্ততে॥"

১৫। গোবিন্দ প্রনাম মন্ত্রঃ

"ওম ব্রহ্মাণ্ড দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চঃ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ॥"

১৬। আচমন মন্ত্রঃ

""ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু।ওঁ তদ্বিষ্ণু পরমং
পদং সদাপশ্যান্তি সুরয়। দিবিব চক্ষুরাততম।""

১৭।গঙ্গা প্রনাম মন্ত্রঃ

"'ওঁ সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।।“

১৮। সূর্য প্রনাম মন্ত্রঃসনাতন ধর্মের মন্ত্র

"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং
মহাদ্যুতিং।ধ্বান্তারিং সর্ব পাপঘ্নং প্রণতোহস্মি
দিবাকরম্।। "

১৯। গীতা পাঠে ভুলের ক্ষমা প্রর্থনা মন্ত্রঃ

নমো যদক্ষরং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেত্ ।

পূর্ণং ভবতু ত্বং সর্বং ত্বং প্রসাদাত্ জনার্দ্দন ।।

২০। সরস্বতী দেবীর প্রনাম মন্ত্রঃ

""নমো সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে
কমললোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষ্মী
বিদ্যাংদেহি নমোহস্ততে।""

২১। পুষ্প শুদ্ধিকরন মন্ত্রঃ

"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে
পুষ্পচয়াবকীর্নে চ হুং ফট স্বাহা।। "

২২। একাদশী পারনা মন্ত্রঃ

"একাদশ্যাং নিরাহারো ব্রতেনানেন কেশব।

প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব।।"

২৩। দেহ শুদ্ধি মন্ত্রঃ

"পাপোহং পাপ কর্মাহং পাপাত্মা পাপ সম্ভাবান্ ।

ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষং সর্ব পাপো হরো হরি ।।""

২৪। শ্রীকৃষ্ণের চরনামৃত পান

"ওঁ অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব্ব ব্যাধি-বিনাশনং ।

কৃষ্ণ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ।।"

২৫। শিবের প্রনাম মন্ত্রঃ

"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হে তবে।

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর।"

২৬। প্রসাদ সেবন মন্ত্রঃ

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মোণি বৈষ্ণবে।

স্বল্প-পুণ্য বতাং রাজন্ বিশ্বাস নৈব জায়তে॥

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,

জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।তা'র মধ্য জিহ্বা অতি,
লোভময় সুদুর্মতি,

তা'কে জেতা কঠিন সংসারে॥

কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,

স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।

সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,

প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ।।"

২৭। জন্ম সংবাদ মন্ত্রঃসনাতন ধর্মের মন্ত্র

"আয়ুষ্মান ভব" ( তিনবার)

২৮। মৃত্যু সংবাদ মন্ত্রঃসনাতন ধর্মের মন্ত্র

"দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু"( পুরুষের ক্ষেত্রে)

"দিব্যান্ লোকান্ সা গচ্ছতু"( নারীর ক্ষেত্রে)

২৯। নৃসিংহ প্রনাম মন্ত্রঃ

জয় জয় জয় শ্রীনৃসিংহ উগ্রং বিরং মহাবিষ্ণুং

জলন্তং সর্বতোমুখং নৃসিংহং বিষনং ভদ্রং

মৃত্যুর মৃত্যো নমাম্যহং শ্রী নৃসিংহ জয় নৃসিংহ

জয় জয় নৃসিংহ প্রহ্লাদেশ জয় পদ্ম

মুখো পদ্ম বৃংঙ্গম।।

৩০। শ্রী রাম-সীতা প্রনাম মন্ত্রঃ সনাতন ধর্মের
মন্ত্র

"রামায় রাম-ভদ্রায় রামচন্দ্রায় মেধষে ।

রঘুনাথায় নাথায় সীতায়ৈ পতয়ে নমঃ।।

**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**
**হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।**

# Ekadashi and Tulusi Theories

